অরণ্য মানিক

বিমলেন্দু চক্রবর্তী

দীপশিখা
২২/২এ বাগবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৩

বন্ধুবর

অ্যাডভোকেট অমরনাথ পালকে

প্রীতি উপহার

লেখকের নিবেদন

সাহেবরা সবে পাহাড়গুলি দখল করে নিয়েছে, বিচ্ছিন্ন প্রতিরোধে আদিবাসীরা রক্তস্নানে পরাজিত, তার পরের সময় উপন্যাসের পাদপীঠ।

নায়ক সাঁওতাল মরদ হলেও তার নির্দিষ্ট কোন জাতি পরিচয় নেই—আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রতীক মাত্র। সাঁওতাল শব্দ বহু ব্যবহার করে আঞ্চলিকতা আনার চেষ্টা করা হয় নি। নায়ক তার চোখ দিয়ে পৃথিবী দেখছে, এ উপন্যাসে তার চোখের মধ্যে লেখক নিজেও আছে।

নায়ক যেমন সে ঠিক তাই কিন্তু একজন নগরবাসী লেখকের কল্পিত। সে যতটা নিজের মত ততটাই লেখকের মত। পরিকল্পিত সব চরিত্র লেখকের এক রকমের আত্মজ

বেলপাহাড়ীতে দেবপাহাড় নামে একটি ছোট পাহাড় আছে। দেবপাহাড়ের গুহার পাশের পাথরে লাল গরুর একটি ছবি আবিষ্কৃত হয়েছে। ছবিটি বোধহয় পশ্চিম বাংলার একমাত্র প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্রের নমুনা। সেই লাল গরুর ছবি আর গুহাটি উপন্যাসের পরিকল্পনার উৎসে দাঁড়িয়ে আছে।

লেখকের অন্যান্য রচনা :

সোপান

মধ্যদিনের গান

প্রতিবিম্ব

শুশুনিয়ার রহস্য

গণগণির গুপ্তধন

ভারতের গুহাচিত্র

পৃথিবীর গুহাচিত্র

ভৈরবী সাধিকা সান্নিধ্যে

বাঘবন্দী

অজন্তার কথা

রহস্যময় আগন্তুক

রহস্যময় মহেন-জো-দড়ো

লুপ্তনগরের গুপ্তধন

…দৈন্য জিনিসটাকে আমি বড়ো বলিনা। সেটা তামসিক। কিন্তু অনাড়ম্বরের কথা বলিতেছি যাহা পূর্ণতারই একটি ভাব, যাহা আড়ম্বরের অভাবমাত্র নহে। সেই ভাবের যে দিন আবির্ভাব হইবে সেইদিন সভ্যতার আকাশ হইতে বস্তুকুয়াসার বিস্তারকলুষ দেখিতে দেখিতে কাটিয়া যাইবে। সেই ভাবের অভাব আছে বলিয়া…

—রবীন্দ্রনাথ

লোকটি গুড়ি মেরে খানিকটা নিচের দিকে নেমে এল।

পাশে শাল গাছের সারি। একের পর এক শাল গাছ। মাঝে মাঝে দু'একটা কেন্দু গাছ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দীর্ঘকায় গাছগুলো সোজা হয়ে আকাশের পানে উঠে গেছে। দাঁড়িয়ে আছে গভীর অরণ্যের মুখে অরণ্য-প্রহরীর মত। তাই মাঝে মাঝে ফাঁক ফোঁকর আছে। নিচের দিকে মাটি পরিষ্কার। কোথাও কোথাও শুকনো ঝরা পাতার স্তূপ। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ঝরে পড়া পাতা পচে পচে মাটির রং কালো। মাটি থেকে একটা গন্ধ উঠে আসছে।

গাছ যেখানে কম সেখানে উইয়ের ঢিপি। মাথা ঠেলে বেশি উঁচুতে ওঠেনি। মাথার দিক আঁকা বাঁকা করে একাধিক চূড়ো তৈরী করে রাখা। উইয়ের ঢিপির মাঝখানে আছে হাজার হাজার উই পোকার নিত্য দিনের সংসার।

শালবনের মাঝখান থেকে এঁকে বেঁকে নিচের দিকে নেমে গেছে শুঁড়ি পথ। পাথর কেটে গভীর খাদ হয়ে নিচের দিকে নেমে গেছে।

লোকটি শুড়ি পথ বেয়ে আরো খানিকটা নিচে নেমে এল।

এখন মাথার উপর সবুজ পাতা। একের পাশে আর একটি পাতা, পাতার উপর পাতা। থরে থরে সবুজ পাতা সাজানো। পাতার ফাঁকে ফাঁকে আঁকা-বাঁকা শালের সরু ডাল। পাতার ফাঁকে বসে একটা পাখী ডাকছে। কুরক····কুরক শব্দ মন্থর হয়ে পাতার ফাঁক ফোঁকর বেয়ে দূরের দিকে চলে যাচ্ছে।

লোকটি পাখীর ডাক শুনতে পেল, গ্রাহ্য করলো না। দুপুর রোদে বনের মধ্যে পাখীর ডাক এক রকমের অলৌকিক পরিবেশ গড়ে তোলে। লোকটির চেতনায় পাখীর কুরক···কুরক ডাক কোন প্রভাব ফেলতে পারলো না। সে সোজা পায়ে আবো খানিকটা নিচে নেমে গেল।

এখন শুড়ি পথ আরো গভীর। দু'পাশে খাড়া মাটির দেওয়াল। মাটির ফাঁক থেকে অমসৃণ পাথর, কাঁকর মুখ বের করে রেখেছে। পায়ের নিচেও এলোমেলো পাথর, ছোট, বড়, ভোতা, তীক্ষ্ণ ধারালো নানা রকমের চেহারা তাদের। কোথাও এক সঙ্গে জড় হয়ে আছে, আবার দু'একটা পাথর দলচ্যুত হয়ে মাটির ভিতর থেকে মুখ তুলে আছে। অসতর্ক হলে এ সব পাথর পায়ে ছোবল মারবে।

লোকটি আরো খানিকটা পথ নিচে নেমে এল। দূরে কোথাও একটা কাঠঠোকরা পাখী গাছ ঠোকরাচ্ছে। ভারী অথচ বিষন্ন একটা ধাতব শব্দ পাতার ফাঁক চুঁইয়ে নেমে এসে বুকের মধ্যে আঘাত করছে।

সে এসে দাঁড়ালো রাস্তার কাছে। শুড়ি পথ রাস্তার উপর দিয়ে গড়িয়ে নিচের দিকে নেমে গেছে। বর্ষার জল হুহু করে শালবন থেকে এই শুড়ি পথ বেয়ে নিচের দিকে নেমে যায়।

রাস্তা এখানে চওড়া। পাথর ফেলে ফেলে সাজিয়ে তৈরী করা। গাঁয়ের যাবার কোন রাস্তা ছিল না। মানুষ হেঁটে যেত, হাঁটতে হাঁটতে পথ তৈরী হল। জঙ্গল, বুনোঘাস দু'পাশে সরে গিয়ে মানুষের চলার পথ তৈরী করে দিত।

সমতল থেকে পাহাড়ে উঠে এল একদল মানুষ। পাহাড়ের কোলে তৈরী হল তাদের গ্রাম। একের পর আর এক গ্রাম। দোকান, হাট বসে গেল। গাঁয়ের নতুন নাম হল। তারা তাদের বস্তি তুলে সরে যেতে বাধ্য হল।

তারা পায়ে পায়ে পাহাড়ের আরো উপরে উঠে গেল। নতুন করে বস্তী তৈরী হল। জঙ্গল হাসিল করে চাষের জন্য আবার নতুন জমি তৈরী করতে হল। কি করবে মানুষ? মানুষকে দু'হাত ব্যবহার করে খেতে হয়—এইত নিয়ম।

লোকটির মাথায়, কাঁধের ওপর রোদ। চোখের নিচে ছায়া। কালো চুল কাঁধের ওপর। মাথার চুলে লাল সুতো বাঁধা। সুতোর

বাঁধনে অবাধ্য চুল সংযত হয়ে থাকতে বাধ্য হচ্ছে। চুল রুক্ষ—অনেক দিন ধরে চুলে তেল পড়েনি।

নাকের দু'পাশে দুটি তীক্ষ্ণ চোখ। ছায়ার মধ্যে চোখ দুটি ধক্-ধক্ করে জ্বলন্ত হাপরের মত জ্বলছে। নাক লম্বা। কোমরে একফালি মলিন কাপড় তার পুরুষাঙ্গ ঢেকে রেখেছে। নয়তো সে প্রায় নগ্ন।

কাঁধ জ্যামুক্ত ধনুকের মত বাঁকা। নগ্ন বাঁকা কাঁধের ওপর টাঙ্গী। সে টাঙ্গীর মসৃণ বাঁট মুঠো করে ধরে রেখেছে। দেহের সব শক্তি হাতের মুঠোয় সংহত হয়ে আছে।

এবার সে আকাশের পানে তাকালো। আকাশ রোদের তাপে জ্বলন্ত ধাতুর মত উজ্জ্বল, মসৃণ। অনেক অনেক ওপর থেকে একটা চিল উড়ে যাচ্ছে। রাস্তা থেকে এক রকমের উষ্ণ হাওয়া উঠে আসছে।

এখান থেকে নিচের গ্রাম দেখতে পাওয়া যায়। নিচের গ্রামের সবুজ ক্ষেত রোদের নিচে ঝলমল করছে। তার মাঝখানে ইঁটে গাঁথা বাড়ীগুলো ভয়ানক বিশ্রী, দাদের চুলকনো ক্ষতের মত দেখতে লাগছে। অবশ্য প্রকৃতির শোভা কিংবা গ্রামের ঘর বাড়ী দেখার কোন আগ্রহ তার ছিল না। সে তাকিয়ে আছে আরো দূরের পানে। চোখে মুখে জিঘাংসার সঙ্গে ঘৃণা। ঘৃণা আর জীঘাংসার তীব্র আগ্রহ চোখে মুখে উতপ্ত লোহার মত জ্বলছে। থেকে থেকে মুখের রং বদলে যাচ্ছে।

পাহাড়ী পথ এখানে সাপের মত বাঁক খেয়ে নিচের দিকে নেমে গেছে। হারিয়ে গেছে নিচের সবুজ ক্ষেতের মধ্যে। সে ঘৃণার সঙ্গে থুথু ফেললো রাস্তার ওপর। নাকের ডগা ফুলে উঠলো। পাথর দিয়ে বাঁধানো রাস্তাকে সে ঘৃণা করে। এই রাস্তা দিয়ে ওপরে উঠে আসে সমতলের মানুষ। তাদের সঙ্গে থাকে রূপোর টাকা। মানুষগুলি মানুষকে নয় ভালবাসে টাকাকে। টাকা হ'লে তারা অহংকারী হয়ে তেজী ঘোড়ার মত ঘাড় সোজা করে রাখে।

সমতলের মানুষরা টাকা এনে দেয় তাদের হাতে। তামা আর রূপোর গোল ধাতব পদার্থগুলি শয়তানের মত নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকে আর রক্তে উষ্ণতা ছড়িয়ে দেয়। ভিতরের মানুষটাকে একটু একটু করে পরে গোটা মানুষটাকে চেটে খেয়ে নেয়। মানুষটা মরে গিয়ে আর একটা মানুষ হয়ে যায়। তাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা আর বিরোধ এনে দেয়।

সমতল থেকে হাওয়া ওপরে উঠে আসছে—উষ্ণ, প্রদাহমান হাওয়া। গাছের পাতা কাঁপছে। লোকটি এ সব লক্ষ্য করছে না। থুথু ফেলছে রাস্তার ওপর আর জ্বলন্ত দৃষ্টি চলে যাচ্ছে পথের বাঁকে।

ঐ বাঁক থেকে ওপরে ওঠে আসবে শনিয়ালাল। ঘোড়ার ওপর উন্নত দেহ। পাটকিলে রঙের ঘোড়াটাকে পাগলের মত ছোটায়। এই পথ পাড়ি দিয়ে চলে যাবে উত্তরে। তারপর ঘোড়া থামাবে পুলিশের আস্তানায়। খাটিয়ায় বসে দাড়োগাবাবুর সঙ্গে সরাব পান করবে। ফিরবে সূর্য অস্ত যাবার আগে। এ পথে জানোয়ারের ভয় আছে।

অবশ্য শনিয়ালাল জানোয়ারকে ভয় পায় না। তার পিঠে একটা বন্দুক ঝুলে থাকে। দু' দুটো বাঘ শিকার করেছে। তার একটা ছিল নরখাদক। সন্ধ্যার আলো আঁধারে পথের পাশে পাতার আড়ালে বসে থাকতো। একা চলা পথচারী পেলে লাফ মেরে রাস্তায় এসে মানুষটাকে তুলে নিয়ে যেত। তার লোভ ছিল রাখাল বালকদের ওপর। মোষ চড়াতে জঙ্গলের পাশে গেলে নিঃশব্দে তুলে নিয়ে যেত।

এক গ্রাম থেকে রাতারাতি অনেক দূরের গাঁয়ে চলে যেত। কখন কোন গাঁয়ে কোন মানুষটিকে পেছন থেকে টুঁটি চেপে ধরবে জানা যেত না। দল বেঁধে সাঁওতালরা কয়েকবার মারবার চেষ্টা করেছে। চতুর বাঘ হাওয়ার সঙ্গে মিলিয়ে যেত তখন। জঙ্গলের মধ্যে সে বোধহয় হাওয়ায় ভড় দিয়ে চলত। নয়তো কারো না কারো চোখে পড়তো। মরার আগে একজনেও বাঘটাকে দেখতে পায়নি। জঙ্গল ঢুরে পাওয়া যেত অর্দ্ধভুক্ত মারী। মারীর চারিপাশে

ধারালো নখের আর থাবার দাগ।

মারী পাহারা দিয়েও বাঘের পাত্তা পাওয়া যায় নি। মারীর সামনে বাঘ ফিরে আসতো না। যদি কখনো আসতো নিঃশব্দে আসতো। কখন এসে মারা নিয়ে সরে যেত পাহারায় বসে থাকা জোয়ানরা টের পেত না।

গাঁওবুড়োরা বলতো, বাঘ নয় শয়তান। প্রেতলোক থেকে বাঘের চেহারায় আসে। হাওয়ার ওপর দিয়ে হেঁটে আসে। মারীর কাছে আসার আগে মন্ত্র পরে পাহারাদারদের ঘুম পাড়িয়ে দেয়। ছুঁচো কখনো খরগোস হয়ে রাস্তার পাশের ঝোপে বসে থাকে। একা মানুষ দেখতে পেলে মুহূর্তে বাঘ হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

শনিয়ালাল পর পর দুটো গুলী মেরে বাঘটাকে মাটিতে শুইয়ে দিয়েছিল। গাঁয়ের মানুষেরা তাজ্জব বনেছিল। শনিয়ালালকে শের বলে স্বীকার করেছে। হ্যাঁ, শের বটে। নিঃশব্দে শিকার করে।

ছুটিয়ার কথা মনে এল। হাসি হাসি উজ্জ্বল মুখ চোখের ওপর ভেসে উঠলো। দেখতে পেল গলার সেই কালো কার। কারের মাথায় একটা দড়ি ঝুলছে। দড়ির মাথায় ধপধপে সাদা পাথর কালো বুকের ওপর চক্ চক্ করে জ্বলছে।

হলুদ ছাপা খাটো কাপড় পড়ে গাঁয়ের পথে প্রজাপতির মত উড়ে বেড়াতো। প্রাণের উচ্ছলতায় অকারণে হেসে উঠতো। মা জোর করে চুল টেনে টেনে আট করে খোপা বেঁধে করোঞ্জা তেল সারা মুখে মেখে দিত। মুখখানা তেল মাখাতে জলের ওপর সূর্যের ছটার মত উজ্জ্বল হয়ে থাকতো।

উচ্ছলতা আর করোঞ্জা তেল মাখা ঝলমলে মুখ, কবোষ্ণ বাঁধন হারা দুটো বুক কাল হল ছুটিয়ার। শেরের দৃষ্টি পড়লো। শনিয়ালাল সিদ্ধান্ত নিল শিকার করবে। ছুটিয়া তার শিকার।

বাঘের চক্করে পড়লো ছুটিয়া। একটু একটু করে বাঘ চক্কর ছোট করে...

কড়রো-রো····কড়রো-রো করে একটা পাখী ডেকে উঠলো। হঠাৎ শব্দে লোকটি চমকে উঠলো। একবার কেঁপে উঠেই শক্ত হয়ে দাঁড়ালো। কালো পা দু'খানা শাল গাছের গুঁড়ির মত রাস্তার ওপর গেঁথে আছে। সূর্য মধ্য আকাশ থেকে পশ্চিম আকাশে চলে গেছে। গাছের ছায়া নেমে এসেছে দেহের ওপর। তার কালো শরীরে ফালি ফালি সাদা রোদের দাগ। দূর থেকে তাকে একটা বাঘ বলে মনে হচ্ছে। বনের পাশে শুড়ি পথের মুখে শাল গাছের ছায়ায় ওৎ পেতে দাঁড়িয়ে আছে।

হাতের টাঙ্গী শক্ত করে ধরে আছে। টাঙ্গী কাঁধের ওপর। হাতের মুঠো শক্ত। ধমনীর রেখাগুলো মুঠোর চাপে ফুলে উঠেছে। চোখ দুটির মধ্যে রক্তের আভা। ক্রোধ, ঘৃণা যুগপৎ মুখখানাকে যেন পাথরের মত শক্ত করে রেখেছে।

সে আবার থুথু ফেললো। বিড় বিড় করে বললো, শের। শের শব্দের মধ্য থেকে বিদ্রূপের চাবুক যেন ঝলসে উঠলো। মাথা একটু নাড়লো।

শানিয়ালাল শের তাতে সন্দেহ নেই। সে আবার থুথু ফেললো।

একের পর এক ফসলের মাঠ শনিয়ালাল থাবা মেরে নিয়ে নেয়। মালিক কোন প্রতিকার করতে পারে না। বোনা ফসল, মকাই, যব, গম, ধান সব শনিয়ালালের হয়ে যায়। প্রতিবাদ করার উপায় নেই। শনিয়ালাল টুঁটি কামড়ে ধরে। নিরুপায় চাষী তখন শনিয়া-লালের পায়ে পড়ে। জমির মালিক পরিণত হয় শ্রমদাসে। নিজের জমিতে নিজে বেগার খাটে।

শনিয়ালালের কোঠী বাড়ি উঁচু হয়। ধাপে ধাপে কোঠী মাথা তোলে আকাশে। একটা ঘরের পাশে আর একটা কোঠী। শনিয়ালাল এখন আবার তিনতলা কোঠী তৈরী করবে। ইঁট তৈরী করার মজুররা

এসেছে। ইটের পাহাড় তৈরী হচ্ছে। শনিয়ালাল সাদা চামড়ার মানুষদের মত পাকা ইটের মকামে বাস করবে।

সাদা চামড়ার মানুষরা শনিয়ালালকে খাতির করে। সে সাদা মানুষদের হয়ে কাজ করে। নফর। কাছারী বাড়ী সামলায়। সাঁওতাল-দের ক্ষেত খামারে কাঠি গুঁজে দেয়। ঘোড়ায় চেপে সাদা মানুষরা মাঠের পাশে এসে দাঁড়ায়। আগুনের মত গায়ের রং। কানের পাস থেকে চুল চিবুকের কাছে এসে শেষ হয়েছে।

সাদা মানুষদের মাথায় লম্বা টুপী। সারা গা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা। পায়ে চামড়ার জুতো। হাতে থাকে লম্বা চাবুক। থেকে থেকে চাবুক সাপের লেজের মত বাতাসের বুকে আছাড় মারে। বাতাস দু'ফাক হয়ে যায়। হিস্ হিস্ করে শব্দ ওঠে। এমনি হিস্ হিস্ শব্দ ওঠে কেউটে সাপের মুখ থেকে সে যখন রেগে যায়। বিশাল ফণা কাঁপতে থাকে। ক্রোধে লেজ ঝাপটা মারে, তখন এমনি বাতাস চিরে দু'ফাক হয়ে যায়।

সে তার নিজের জমিতে আর নামতে পারবে না। কথাটা মনে আসতেই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটা নড়ে উঠলো। বুক একবার হাপরের মত ফুলে উঠে বেলুনের মত চুপষে গেল। তার চষা জমি, জমিতে মাথা তুলে দাঁড়ানো মকাই শনিয়ালালের মালিকানায় চলে গেছে। এমন হবে বুঝতে পারলে বাপ ব্যাটা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জমি চষে মকাই ফলাতো না।

বাপের মুখ চোখের সামনে ভেসে উঠলো। বয়সের ভারে ঘাড় একটু বাঁকা হয়ে গেছে বলে মাথা নিচের দিকে ঝুঁকে থাকে। শিরদাঁড়া ধনুকের মত বাঁক খেয়েছে বলে হাড়ের গাঁটগুলো গুনতি করা যায়। সারা মুখে আঁকিবুঁকি রেখায় চষা ক্ষেতের মত। ঘাম মুখের ভাঁজ থেকে চিবুক বেয়ে শ্রমে ফুলে ওঠা বুকের উপর পড়তো। তবু বুড়ো মানুষটা গাছের ছায়ায় গিয়ে বসতে রাজী হত না। হাতের লগুড় দিয়ে আঘাত করে ডেলা পাকানো মাটিকে গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলতো।

তিন কুড়ি টাকা বুড়ো কর্জ নিয়েছিল। সেই তিন কুড়ি টাকা এক একবার চাঁদ ওঠা আর অস্ত যাবার সুযোগে বদলে গেল। বদলে বদলে জঙ্গলের একটা গাছের ডালে ঝুলে থাকা অজগরে পরিণত হল। একদিন পাক খুলে অজগর তাদের উপর পড়লো। ব্যাস, তাদের ক্ষেত খামার সব গিলে খেয়ে নিল।

এখন তারা জমিহীন। প্রথমে বিশ্বাস করতে পারে নি। মানুষ আছে আর তার ফসল ফলাবার জমি নেই! এরকম হয় নাকি? মানুষ থাকলে তার জমি থাকবে। নয়তো লোকটা ফসল ফলাবে কোথায়? এমন হতে পারে! জমি নেই মানুষ আছে তাতো ভাবতেই পারে নি।

বুড়ো বাপ বিশ্বাস করেছিল কিন্তু স্বীকার করতে পারে নি। প্রথম মাথা নেড়ে বিড় বিড় করে বলেছে, আমার, ক্ষেতি আমার। টেফাঙ্গের বাচ্চারা ক্ষেতিতে নামবি না। তারপর হঠাৎ একটা বাঘের মত লাফিয়ে উঠেছিল। হাতের লাঠি তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটার কাঁধের উপব বসিয়ে দেয়। অমনি বুড়োর সব শক্তি শেষ হয়ে যায়। নব্বই বছর বয়সের ভার তাকে মাটিতে যেন ছুঁড়ে ফেলে দেয়। মুখ থুবড়ে পড়ে যায় মাটির উপর। কাঁধটা লাগে পাথরে। অমনি কাঁধে একটা গর্ত হয়ে রক্ত বেরিয়ে আসে। রক্তে ভিজে যায় মাটি।

বুড়োর কথা মানুষটার কানের মধ্যে কয়েক দিন হল এখনো গেঁথে আছে। কাড়ের ফলা হয়ে কানের মধ্যে বিঁধে আছে। বুড়ো লাঠিটা মারার আগে বলেছিল, তু কি বইলছিস, ই একটা কুথা হল? এ জমির ফসল শনিয়ালালের হয়া গেছে! উ শালো ফসল তুলে লেবে, বুড়ো আর কথা বলতে পারে নি। হঠাৎ একটা বাঘের মত লাফিয়ে উঠে···

লোকগুলো বুড়োকে চ্যাংদোলা করে তুলে নিল। চল শালা, শনিয়ালালের কাছে। গায়ে হাত তোলা! শালা, তোর চামড়া দিয়ে ঢোল তৈরী করে বাজাবো।

একটা লোক হাত দুটো চেপে ধরেছে। অন্য লোকটা দুটো পা। বুড়ো মানুষটা দুটো মানুষের হাতে ঝুলতে ঝুলতে যাচ্ছে। কাঁধ থেকে

ফোঁটা ফোঁটা রক্ত রাস্তার উপর পড়ছে। কারো চোখে পড়ছে না।

গাঁয়ের লোক সব দূরে সরে দাঁড়িয়ে আছে। দেখেও তারা কিছু দেখছে না। বুড়ো মানুষটাকে একটা মরা বকরীর মত নিয়ে যাচ্ছে শনিয়ালালের লোকেরা। সাঁওতালরা দেখতে পাচ্ছে না। অথচ তারা দাঁড়িয়ে আছে পথে। সবাই গাছ হয়ে গেছে। গাছ হয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

তার বুক ফুলে উঠলো। সে একটা পা একটু সামনে প্রসারিত করে দিয়ে দাঁড়ালো। পিঠে টান লাগলো। পিঠ আবার চড় চড় করে উঠলো। সে সোজা হতেই কে যেন পেছন থেকে ধারালো নখ দিয়ে পিঠ আঁচড়ে দিল। তবু সে নুয়ে পড়লো না। পাথরের মত শক্ত হয়ে দাঁড়ালো। তার পায়ের পাশে এখন তার ছায়া। ছায়া কালো। তার অনিবার্য দুঃখ আর সর্বনাশের মত পা ছুঁয়ে শুয়ে আছে।

লোকটা শুড়ি পথে আবার ঢুকে গেল। গাছের ছায়ার মধ্যে দাঁড়ালো। এখন তার সামনে একটা বুনো আতা গাছ। গাছটার গায়ে একটা লতা জড়িয়ে নিবিড় করে রেখেছে। সে সেই আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালো। একবার রাস্তা দেখে নিল। রাস্তা থেকে তাকে দেখা যাবে না। সে নিশ্চিন্ত হতেই বসলো ছায়ার মধ্যে। কামড় খাওয়া বাঘের মত ওৎ পেতে বসলো।

উপত্যকার পথ থেকে ঘোড়ার খুরের শব্দ ভেসে আসছে—খট্‌.... খট্‌....খট্‌....ঘোড়া যেন পাথরের বুকে খুর ঠুকে আগুনের ফুলকী ছুটিয়ে ধেয়ে আসছে।

গতকাল মানুষটার সারা দেহে মনে অবসাদ ছিল। ক্লান্তি আর বিতৃষ্ণা তাকে একটা বিচালীর গাদার উপর ফেলে রেখেছিল। পিঠের উপর ছিল রোদ। পিঠ জ্বালা করছিল। মনে হয়েছিল এক আঁজলা

আগুন পিঠের উপর রেখে সে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। পিঠের জ্বলুনী রোদের তাতে না চাবুকের খাবলে নেওয়া মাংসের জন্য বুঝতে পারছিল না। মাথার মধ্যে যন্ত্রণার সঙ্গে ছিল অদ্ভুত এক শূণ্যতা। এ রকম শূণ্যতা মাঠ থেকে ফসল কেটে নিলে মাঠের বুক জেগে থাকে। বিশাল ক্ষেত খানায় তখন কিছু নেই। খাঁ···খাঁ···করে দুপুরে ডেকে ওঠা কাকের গলার স্বরের মত। মাঠে তখন থাকে কিছু পরিত্যক্ত পাতা আর ফসলের ডালপালা। ছিন্ন বিছিন্ন অসংলগ্ন অবস্থায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। তার মাথার মধ্যে শূণ্য মাঠের দৃশ্যের মত ছেঁড়া ছেঁড়া ছবি কখনো কখনো ভেসে উঠছিল। কিন্তু চোখ খুললে আর তাদের দেখতে পাচ্ছিল না। রোদের তাপ তার চোখে আবার শূণ্যতা এনে দিচ্ছিল।

এখন সে অন্য রকম। তীক্ষ্ণ এক ঘৃণা তার কণ্ঠার কাছে লেপ্টে আছে। সে ঘৃণা তীরের ফলার মত ধারালো। কখনো কখনো ঘৃণার ধারালো ফলা ঝটকা মেরে বুকে নেমে যাচ্ছে, অমনি হাতের মুঠো আরো শক্ত হয়ে টাঙ্গীর বাঁটের উপর চেপে বসছে।

শনিয়ালালের ঘোড়া উপরে উঠে আসছে। সে যখন ঘোড়া ছোটায় জোরেই ছোটায়। রাস্তার ধুলো উড়িয়ে উড়ে যায় উল্কার মত। পিছনে পড়ে থাকে ভীত বিহ্বল গাঁয়ের মানুষ। শনিয়ালাল এই পাহাড়ী এলাকার শের, মুকুটহীন সম্রাট।

ছায়ার মধ্যে বসে থেকেও মানুষটা ঘামছে। শিরদাঁড়া বেয়ে ঘাম পিঠের উপর দিয়ে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। সূর্যের তাপ এখন একটু কম। কিন্তু হাওয়া নেই বলে আরো বেশি ঘামছে।

তার নিজের শরীরের মধ্যে আর একটা সূর্য আছে। সে সূর্য প্রচণ্ড তাপ রক্তে ছড়িয়ে দিচ্ছে। সে নিজের রক্তের সেই উষ্ণ তাপ অনুভব করছে। চওড়া বুকখানা ফুলে ফুলে উঠছে। হাত, পায়ের শিরা এখন টান টান। চিবুক পাথরের মত শক্ত। চোয়ালের উপর চোয়াল শক্ত হয়ে বসাতে দাঁতে দাঁত লেগে আছে। তার চোখ দুটি জ্বলছে। শানিত

দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে পথের ওপর। সে আপন মনে বিড় বিড় করে বললো, একবার মাত্র, একবার।

হ্যাঁ একবার, একবারের পর আর একবার সুযোগ পাওয়া যাবে না। এসব কথা মনে আসতেই সে নিজের মধ্যে চুপসে গেল। এতক্ষণ ধরে ধিক ধিক করে জ্বলতে থাকা আগুন এক লহমায় নিবে গেল। তার চোখ ঝাপসা। ভিতরের সূর্য নিবে গেছে, এবার আকাশের সূর্য নিবে যাবে?

যদি ভুল হয়? ভুল হতেই পারে। শিকার আর শিকারীর এক জনের ভুল হবেই, নয়তো শিকার হয় না। প্রশ্ন হল কে ভুল করবে, কার ভুল হতে পারে। ভুল করলে শিকার করতে এসে শিকার হয়ে যেতে হয়। সে সফল হতে পারে আবার নাও হতে পারে। বর্তমান ক্ষেত্রে তাকে সফল হতেই হবে। আর সুযোগ আসবে না। প্রথম সুযোগকেই তাকে কাজে লাগাতে হবে।

এসব কথা মনে আসতেই ভিতরের সূর্য আবার দপ্ করে জ্বলে উঠলো। রক্তের মধ্যে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে গেল। এবার সে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেল। কাল সারাদিন শুয়ে শুয়ে এসব কথা ভেবেছে। শিকারে সফল হলে তাকে পালাতে হবে। শিকারে যদি ব্যর্থ হয়? ব্যর্থ হলেও পালাতে হবে। তার সামনে অন্য আর কোন পথ নেই।

সে ঘৃণার সঙ্গে খানিকটা থুথু ফেললো। মনে মনে বললো, আমাকে সফল হতেই হবে। অমনি তার দাঁতের উপর দাঁত চেপে বসলো। আবার চিবুক পাথরের মত শক্ত হল। মাথায় ঝাঁকুনি দিয়ে সব ভাবনা যেন ঝেড়ে ফেললো। রুক্ষ চুল এলোমেলো হয়ে মুখের ওপর ছড়িয়ে পড়লো। হাত দিয়ে চুল পিছন দিকে সরিয়ে দিল। মেরুদণ্ড টান টান হয়ে গেল। পিঠ চড় চড় করে উঠলেও টের পেল না। টাঙ্গীর বাট শক্ত করে চেপে ধরলো।

আত্মবিশ্বাসে সে ভরপুর। বুক ভরে বাতাস নিল। ডান পা সামনের দিকে এগিয়ে বাঘের মত লাফ দেবার জন্য ঘাপটি মেরে বসলো।

চোখ গেল টাঙ্গীর ফলায়। পাতার ফাঁক থেকে এক ফালি রোদ এসে পড়েছে। রক্ত ক্ষুধায় টাঙ্গী ধাতব উজ্জ্বলতা নিয়ে ঝক্ ঝক্ করছে।

ঘোড়সওয়ার আরো উপরে উঠে এসেছে। মাথায় সাদা পাগড়ী। নাকের নিচে বিশাল গোঁফ। গোঁফের শেষ প্রান্ত সুচালো হয়ে উপর দিকে বেঁকে আছে। পুষ্ট গর্দান। ফতুয়ার নিচে চওড়া বুক।

হঠাৎ ঘোড়ার গতি শ্লথ হল। টের পেয়েছে? পাথরের ফাঁক থেকে মুখ বের করলো মানুষটি। দেখতে পেল শনিয়ালালকে।

ধূর্ত শনিয়ালালের মনে সন্দেহ জেগেছে। শনিয়ালাল নিজেও শিকারী। শিকারে সে অসাধারণ দক্ষ। একমাত্র বনের জানোয়ার শিকার করে না, তার বড় শিকার মানুষ।

মানুষ শিকার সব থেকে কঠিন। প্রতিটি মানুষ বাঁচতে চায়। বাঁচতে চায় বলে ক্ষেতখানাকে সে আগলে রাখে। ক্ষেত তাদের জঠর, নাড়িভুড়ি। ক্ষেতের মাটি আর ফসল তাদের হাত পা।

শনিয়ালাল বনের জানোয়ারের মত মানুষের ক্ষেত শিকার করে। সে জানে কখন কিভাবে কার ক্ষেত থাবা মেরে তুলে নিয়ে গিলে খেতে হবে। সময় মত থাবা বাড়ায়। সে ভুল করে আগে বা পরে থাবা মারে না। বনের জানোয়ার শিকারে সময় মত গুলি ছুড়ে দেয়। সে চতুর তাই সাবধানী।

শনিয়ালালের সন্দেহ জেগেছে। সে জমি শিকার করে, সে প্রয়োজনে মানুষ বাঘের চেয়েও ভয়ঙ্কর, কারো বুকে মুখ লাগিয়ে রক্ত চুষে খেয়ে নেয় না। অথচ বস্তীর কত মানুষের রক্ত শুষে তাদের একেবারে শেষ করে দিয়েছে।

তাদের অনেকে এখন শ্রমদাসের জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছে। কয়েকখানা যবের রুটির বিনিময়ে শনিয়ালালের জমিতে লাঙ্গল টানে।

লোকটি সরে বসলো না বা আড়ালে সরে গেল না। পাথরের মত স্থির হয়ে বসে আছে। পিঠ টান টান। কোন যন্ত্রণা টের পাচ্ছে না। এক লক্ষ্যে স্থির। চোখে পলক ফেলছে না। ঘাড় সোজা। হাত,

পা, হাটু, বুক সব ছিলে আটা ধনুকের মত টান্ টান্।

ঘোড়া আবার দৌড় শুরু করেছে। শনিয়ালালের মাথায় পাগড়ী বাঁধা। পাগড়ীর স্খলিত প্রান্ত পতাকার মত পেছন দিকে উড়ছে।

ঘোড়া এসে পড়লো সামনে। অমনি মানুষটি জ্যামুক্ত ধনুকের মত লাফিয়ে উঠলো। বিদ্যুৎ ঝলকের মত টাঙ্গী বেড়িয়ে গেল হাত থেকে। বাতাসের বুক চিরে ছুটে গিয়ে গেঁথে গেল শনিয়ালালের চিবুকের নিচে গলার মাঝখানে।

ঘোড়া থমকে দাঁড়ালো। শনিয়ালালেব দেহ ঘোড়ার ডান পাশে ঝুলে পড়েছে। রেকাবে পা আটকে আছে। এক হাতে ঘোড়ার লাগাম থাবলে ধরে রাখা। হাত থেকে এবার লাগাম খসে গেল। হাতটা এখন কিছু একটা ধরতে চাইছে। ঘোড়ার মসৃণ গা থেকে বার বার পিছলে যাচ্ছে। আর পারলো না শনিয়ালাল। লম্বা দেহ এক ঝটকায় নিচের দিকে পাক খেয়ে গেল। রেকাব থেকে পা এবার বাইরে বেরিয়ে এল। পা বেরিয়ে আসাতে গড়িয়ে পড়লো রাস্তায়।

সঙ্গে সঙ্গে আকাশের বুক চড়াৎ করে ছিঁরে দু' ফাঁক হয়ে গেল। প্রচণ্ড জোরে শব্দ হল। শব্দ নিচে গড়িয়ে নেমে না যেতেই আবার আকাশের বুক দু'ফাঁক হল। গুড়ুম করে আবার যেন বাজ পড়লো। কি যেন কানের পাশ থেকে তীরের মত বেরিয়ে গেল।

দু' পাশের শালবন আকাশ ফাটার শব্দে কেঁপে উঠে স্থির হল। পাখীর ঝাঁক আর্ত চীৎকার তুলে উড়ে গেল আকাশে। শব্দ দ্রুত নিচের দিকে নেমে গিয়ে হারিয়ে গেল। উপত্যকা থেকে হা-হা করে এক থাবলা হাওয়া এসে শাল বনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। গাছগুলো ভয়ে একবার মাথা নামিয়ে আবার খাড়া হলো।

এবার লোকটি রাস্তার মাঝখানে এসে দাঁড়ালো। তার ছায়া পায়ের কাছে এখন লম্বা হয়ে রাস্তার ওপর শুয়ে আছে। তার চেয়ে তার ছায়া এখন অনেক বড়। বুকখানা সাফল্যের আনন্দে ফুলে আছে। নিজের ছায়ার পানে একবার বিস্মিত চোখে তাকালো। রাস্তার ওপর

শুয়ে থাকা ছায়া মানুষটাকে বড় মনে হল। তার ভিতর যে আর একটা মানুষ আছে সে বাইরে বেরিয়ে এসে তাকে সাহস দিচ্ছে।

সে আপন মনে বললো, তু, সাহস দেখাইলি হে। মরদ বটে।

এবার সে ছুটে গেল শনিয়ালালের কাছে। তার সঙ্গে পাশে পাশে দৌড়ে গেল তার লম্বা ছায়া। শনিয়ালালের সামনে থমকে দাঁড়ালো। তার লম্বা ছায়া শনিয়ালালের বুক বেয়ে বন্দুক ডিঙ্গিয়ে ওপারে চলে গেল।

এবার টাঙ্গীখানা গলা থেকে খুলে নিতে হবে। নয়তো খুনের সাক্ষী থেকে যাবে। সাদা চামড়ার মানুষগুলো ভয়ঙ্কর। কুকুরের মত তাদের লম্বা নাক। তুমি যত দূরেই থাক না কেন ওরা তোমার খোঁজ পাবে। লুকিয়ে থাকলে গন্ধ শুঁকে শুঁকে ঠিক জায়গায় পৌঁছে যাবে।

শনিয়ালাল কাত হয়ে রাস্তার ওপর পড়ে আছে মুখ হাঁ করে রেখেছে। এত বড় হাঁ করে আছে যে আলজিভ দেখা যাচ্ছে। চোখ দুটো খোলা। মরা মাছের মত নিষ্পলক দৃষ্টিতে আকাশের পানে তাকিয়ে আছে। থেকে থেকে জিভ বাইরে বেরিয়ে এসে আবার ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। বাঁ হাতখানা পিঠের নিচে। শনিয়ালাল নিষ্পলক চোখে অদ্ভুত দৃষ্টিতে আকাশের পানে তাকিয়ে থেকে মরার জন্য খাবি খাচ্ছে।

ঘোড়াটা একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। পড়ন্ত বেলার রোদে পাটকিলে রঙের ঘোড়াটাকে একটা আজব জানোয়ারের মত দেখাচ্ছে। কাঁধ থেকে লম্বা চুল নিচের দিকে ঝুলে থাকার কথা, তা নেই। অবাক চোখে তাকিয়ে আছে শনিয়ালালের পানে। আকস্মিক ঘটনায় পাটকিলে রঙের ঘোড়া এখন বিভ্রান্ত। কি করবে বুঝতে পারছে না অথবা ঘটনার তাৎপর্য বুঝতে চাইছে। ঘাড় লম্বা করে দিয়েছে। ঘাড়ের সাদা চুল সজারুর কাঁটার মত দাঁড়িয়ে আছে।

ঘোড়াটার প্রতি তীব্র ঘৃণা অনুভব করলো লোকটি। শয়তানের

বাহন। এক ডেলা থুথ্ ফেললো। আবাব ঘোড়াটাকে দেখলো। এবার দাঁতের উপর দাঁত চেপে বসে গেল। রাস্তার পাশে চলে গেল। একখানা পাথর তুলে ছুরে মারলো ঘোড়ার মুখ লক্ষ্য করে।

পাথর গিয়ে আছড়ে পডলো ঘোড়ার চিবুকে। যন্ত্রণায় বিশ্রী গলায় চিৎকার করে উঠলো ঘোড়া। ভয় পেয়ে দৌড় লাগালো নিচেব দিকে। ঘাড়ের সাদা চুল উড়তে থাকলো হাওযায়। মুহূর্তে মিলিযে গেল উপত্যকার পথে জঙ্গলের বাঁকে।

এবার সে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল, দাঁড়ালো গিয়ে শনিয়ালালের কাছে। শনিয়ালাল কাত হয়ে পড়ে আছে। জিভ আর নড়ছে না। শরীর স্থির। চোখ দুটো বিস্ফারিত। সেই বিস্ফারিত চোখে হেলে পড়া সূর্যের আলো। মাথাব পাগড়ী ঘোড়ার পায়ের চাটে ছিটকে এসে পায়ের কাছে পড়ে আছে। বন্দুকটা শনিয়ালালের পাশে। ডান হাতের পাশে লম্বা হয়ে শনিয়ালালের মত শুয়ে আছে। শনিয়ালালেব হাতের পাঞ্জা বন্দুকের নিচে। হাতের পাঞ্জা থেতলে গেছে। গলার ঠিক মাঝখানে টাঙ্গী আমূল বিঁধে আছে।

বন্দুকটায় রোদ। ধাতব উজ্জ্বলতায চক্ চক্ করছে। সে নুযে বন্দুকটা তুলে নিল হাতে। কি কুৎসিৎ দেখতে এই অস্ত্রটা। অথচ ভয়ঙ্কর। আকাশের বাজ বুকের ভিতর পুরে রেখেছে। কখন যে সে আছড়ে পড়বে বোঝা যায় না। অদ্ভুত এক ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা অনুভব করলো নিজের মধ্যে। বন্দুকটাকে পাথরের উপব আঘাত করলো। ঝন্ ঝন্ আওয়াজ করে আগুনের ফুলকি ছিটকে দিল। সে আর বন্দুক হাতে রাখলো না। পাশের জঙ্গলে ছুড়ে ফেলে দিল।

আবার শনিয়ালালকে দেখলো। এক ডেলা থুথ্ ফেললো লোকটা। চাপা গলায় বললো, হারামখোর। লে, এবার লে···খা····খা বস্তী খা····ক্ষেতী খা····

ঘৃণার সঙ্গে কথাগুলি বলে সে আবাব থুথ্ ফেললো। এবার থুথ্ ফেলতে গিয়ে হঠাৎ তার জিভ অসার হয়ে গেল। তার সামনে

রাস্তার উপর চিং হয়ে পড়ে আছে পাহাড়ী এলাকার সব থেকে হিংস্র চিতা। এই চিতাটাকে সে শিকার করতে চেয়েছিল। সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কাল রাত্রে।

সে বিচালীর গাদা থেকে বাড়ী ফিরেছিল। অন্ধকার ঘরে ঢুকে কাউকে দেখতে পায় নি। কাকেইবা দেখতে পাবে? ঘর ছিল শূন্য। কিন্তু টাঙ্গীখানা ছিল। বেড়ার গায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তখন তার মাথায় দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত এসেছিল। সে মারবে অথবা মরবে।

শেষ পর্যন্ত সে পেরেছে, শনিয়ালালকে একটা শুয়োরের মত টাঙ্গী মেরে শেষ করে দিয়েছে। এখন আর কিছু করার নেই। নিজেকে ভয়ানক শূণ্য বলে মনে হচ্ছে তার। হঠাৎ যেন ঝড় থেমে গেছে। ঝড় ছিল নিজের মধ্যে। একটা সূর্য জ্বলছিল বুকে—ঘৃণা আর প্রতি-হিংসার সূয।

এখন ঝড় আর নেই। রক্তের মধ্যে জ্বলন্ত সূয নিভে গেছে। এখন সে লক্ষ্যহীন। কোন উদ্দেশ্য খুঁজে পাচ্ছে না। রাস্তার মাঝখানে শাল গাছের মত দাঁড়িয়ে আছে।

হঠাৎ শনিয়ালালের শরীর কেঁপে উঠলো। চমকে উঠলো সে। শনিয়ালালের শরীর একবার কেঁপে উঠে চিরকালের মত স্থির হল।

অমনি সে আবার সজীব হয়ে উঠলো। শনিয়ালালের বিদেহ প্রাণ এসে যেন তাকে জাগিয়ে দিল। বাঁচা, বেঁচে থাকতে পারার কথা মনে এল। তার বিহ্বলতা মুহূর্তে উধাও হয়ে গেল।

এবার সে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। অমনি পিঠে টান পড়লো। পিঠ চিড় বিড় করে উঠলো। ধারালো নখের জ্বালা অনুভব করলো নিজের পিঠে। কাঁধের নিচ থেকে চার চারটা বাঁকা দাগ কোমর পর্যন্ত গড়িয়ে গেছে। চাবুক খুবলে খুবলে পিঠের চামড়া তুলে নিয়েছে। পিঠ টান করতেই আবার পিঠের চামড়ার উপর দিয়ে ছুরির ফলা অদৃশ্য হাতে কে যেন টেনে দিল।

লোকটি মুখ বিকৃত করলো। কণ্ঠা থেকে এক ড্যালা থুথু উঠে এল

মুখের গহ্বরে। থুথুর ডেলা গক করে গিলে নিল।

এবার শনিয়ালালের গলায় বিঁধে থাকা টাঙ্গীর লম্বা বাট দু'হাতে দিয়ে আঁকড়ে ধরলো। একটা পা তুলে দিল শনিয়ালালের বুকের ওপর। পা দিয়ে শনিয়ালালের বুকে চাপ দিয়ে টাঙ্গীতে টান দিল। অমনি গলা থেকে টাঙ্গী খুলে এল। টাঙ্গী উঠে আসতেই রক্ত গড়িয়ে নামলো।

প্রথম খানিকটা রক্ত ছিটকে উঠলো। ছিটকে উঠে খানিক রক্ত এসে লাগলো তার বুকে। তারপর হাঁ হয়ে থাকা গলা থেকে রক্ত গড়িয়ে নামতে থাকলো।

বুকের রক্ত হাতের চাটু দিয়ে মুছে ফেললো লোকটি। টাঙ্গী ঘষে ছাপ করলো শনিয়ালালের জামায়। সাদা জামায় কতগুলো লাল ছোপ ছোপ দাগ ধরে গেল। প্রতিটি দাগ দেখতে হল এক একটা লাল চোখের মত। লাল চোখগুলো চক্ চক্ করছে, তাকে দেখছে।

এড়িলিংকোড়া, বিকৃত গলায় খিস্তি দিল সে। মুখটা সরিয়ে নিল। বীভৎস রক্তের দাগগুলো আর দেখতে চায় না সে। নিজের পাশে তাকালো। তার ছায়া আরো লম্বা হয়েছে কিন্তু আগের মত স্পষ্ট নয়, ঝাপসা। ভিতরের মানুষটা এবার চলে যাচ্ছে—তাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

ভিতরের মানুষটাকে সব সময় পাশে অথবা নিজের মধ্যে পাওয়া যায় না। কখনো কখনো মানুষটাকে পাওয়া যায়। এবারে ভিতরের মানুষটা যে চলে যাবে তাতে আর সন্দেহ রইল না তার।

সামনের দিকে তাকাতেই দেখতে পেল মানুষ দুটিকে। রাস্তা সমতলের দিকে নেমে বাঁক নিয়েছে। সেই বাঁকের মুখে উঠে আসছে দুটি মানুষ, শনিয়ালালের সাকরেদ।

সাকরেদ দুটিকে দেখে হঠাৎ সে পাথর হয়ে গেল।

শনিয়ালালের সাকরেদ দুটি দৌড় লাগালো। দেখতে পেয়েছে শনিয়ালালকে। রাস্তার উপর পড়ে আছে। পাশেই টাঙ্গী হাতে

শালগাছের মত দাঁড়িয়ে আছে চকুয়া।

দৌড়ে এসে থমকে দাঁড়ালো শনিয়ালালের সামনে। বিস্মিত চোখে তাকিয়ে রইল খানিক সময়। বুঝতে পারছে না দেখা দৃশ্য সত্য বলে স্বীকার করবে কিনা। কিন্তু সবটাই বাস্তব সত্য। রক্তের মধ্যে শনিয়ালাল পড়ে আছে।

একজন মাথা নাড়লো। বিড় বিড় করে বললো, মর গিয়া, হা রাম।

অন্যজন বিকৃত গলায় চিৎকার করে উঠলো, খুন। শালো, তু খুন কিয়া।

তীরের ফলার মত খুন শব্দ এসে লোকটির কানের মধ্যে বিঁধে গেল। অমনি সে সম্বিত ফিরে পেল। ভিতরের সেই মানুষটা তাকে ছেড়ে দিল। এবার সে একা। এখন বুঝতে পারছে পরিস্থিতি। এলাকার সব থেকে সম্ভ্রান্ত আর ভয়ের মানুষটিকে সে খুন করেছে।

তার পায়ের কাছে সেই সাহসী, লোভী, চতুর, পাহড়ীমেয়েদের আতঙ্ক মানুষটির লাশ পড়ে আছে। সাদা মানুষেরা শনিয়ালালকে খাতির করে। তার হাত দিয়ে কানুন জারি হয়। সেই শনিয়ালালের লাশ পাথর ফেলে তৈরী করা রাস্তার উপর একটা বাঘের মত শুয়ে আছে। তার বিশাল দেহের চারপাশে রক্ত। রক্ত এখনো গড়িয়ে নামছে, একের পর এক ধারা তৈরী করে নিচের দিকে নেমে চলেছে। রাস্তার উপর রক্তের আঁকা বাঁকা ধারা যেন একটা বাঘছাল তৈরী করছে।

বিদ্যুৎ ঝলক যেন মাথার মধ্যে একটা ঝটকা খেল। ফস করে যেন শূকরের গায়ের উপর থেকে ছাল তুলে নেওয়া হয়েছে। সে দেখতে পাচ্ছে লাশ দুটোকে। শূকর নয় দু'দুটো মানুষ, মানুষ দুটিকে গড়হাম গাছের ডালের সঙ্গে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। পা দুটো দড়ি দিয়ে বাঁধা। মাথা নিচের দিকে ঝুলছে। সেই ঝুলন্ত দেহের পিঠের উপর সপাং সপাং করে চাবুক আছড়ে পড়ছে। এক এক খাবলা চামড়া চাবুকের সঙ্গে উঠে আসছে।

মানুষ দুটো মরে গেল। একই ভাবে গাছের ডালে তাদের লাশ

ঝুলে রইল। বাতাসে গাছের ডালে ঝুলন্ত লাশ দুটো দিনের পর দিন দোল খেয়েছে। ফুলে ঢোল হয়েছে। পচে গন্ধ ছড়িয়েছে।

কারো সাহস হয়নি পচা লাশ দুটিকে নামিয়ে এনে আগুন জ্বালিয়ে দিতে। সাদা চামড়ার মানুষদের কানুন ওরা মানে নি। সাদা মানুষের হয়ে শনিয়ালাল বিচার করেছে। দুটো জ্যান্ত মানুষকে ঝুলিয়ে লাশ করেছে। একটা সাদা চামড়ার মানুষ কাঠের একটা আসনে শুভোবাবুর মত বসে ছিল। পায়ের উপর পা তুলে বসেছিল। পা চামড়া দিয়ে ঢাকা। হাতে একটা ছড়ি। তার পিছনে তিনজন বন্দুকধারী। সাদা চামড়ার মানুষটি হাতের ছড়ি জুতোর উপর ঠুকে ঠুকে শিস্ দিচ্ছিল।

চাবুক মেরে মেরে মানুষ দুটির পিঠের ছাল মাংস সব তুলে নিয়েছিল। দু'জনের একজন ছগনলাল অন্যজন সুখন।

সুখনের সঙ্গে রাস্কাকানা ছুটিয়ার। করোঞ্জ তেল মুখে মেখে মুখ খানাকে চকচকে করে রাখতো। খোঁপায় গুঁজতো লাল ফুল। ঝুটী তোলা মুরগীর মত বক বক করতো। পুষ্ট বুক চিতিয়ে হাসতো রূপের অহংকারে। যখন তখন খিল খিল করে হেসে গড়িয়ে পড়তো। থল্থলে নরম পাছা দুলিয়ে দুলিয়ে গান করতো—

কুলি কুলি আকাম সেনঃ হারাধন
তালা কুলি তিঙ্গুন হারাধন।

পথে পথে ঘুরে বেড়াও আমার প্রিয়, এবার একটু দাঁড়াও প্রিয় আমার, মনের কথা বলবো তোমায়…

সুখনের দাঁড়াবার উপায় ছিল না। শানিয়াল তখন হন্যে হয়ে তাকে খুঁজছে। সুখনের সঙ্গে আছে ছগনলাল। তারা সাদা চামড়ার মানুষদের কানুন মেনে পিতৃপুরুষের ক্ষেতি বেচবেনা।

অদ্ভুত এক কানুন। টাকা নিয়ে পিতৃপুরুষের ক্ষেতি এমনকি জমি ঘর বাড়ি সব বিক্রি করা যাবে।

রুখে দাঁড়ালো সুখন। ঐ কানুন মানবেক নাই।

কেন মানবে? কার জমি, ক্ষেতি, বাড়ি বেচবে? বাপের কাছ থেকে পাওয়া ক্ষেত আর বসত জমি। তার বাবা পেয়েছিল তার বাবার কাছ থেকে।

সে বাবা জমি পেল কার কাছ থেকে?

তার বাবার কাছ থেকে।

সে বাবাটা কোথায় পেল ক্ষেতি আর জমি?

সিরিমারে সিংবোঙা, ওতরে পঞ্চ। মাথার উপর সিংবোঙা দেওতা আর পৃথিবীতে পঞ্চায়েত।

দুজনেই শনিয়ালালের শিকার হয়ে গেল। শিকার করে তুলে দিয়েছিল সাদা চামড়ার মানুষদের কাছে। এখন তারা আর স্বাধীন নয়। সাদা চামড়ার মানুষদের কানুন মেনে চলতে হয়। নানা রকমের কানুন আছে। সে সব কানুন তারা জানে না, বুঝেতেও পারে না। গাঁয়ের মাঝি কিছু কিছু জানে, কিন্তু বুঝতে পারে না। বুঝবে কি করে? কানুন আসে না সিংবোঙা বা পঞ্চর কাছ থেকে। কানুন আসে সাদা চামড়ার মানুষদের কাছ থেকে। তাই শনিয়ালাল জানে, বোঝে। গাঁয়ের মাঝি ভাল করে বুঝতে পারে না। হাঁ করে শানিয়ালালের মুখের পানে তাকিয়ে থাকে আর মাথা নাড়ে। মাঝে মাঝে বলে ওঠে, হাপে-হাপে।

গড়হাম গাছের ডাল দোল খেল হাওয়ায় অমনি ঝুলন্ত লাশ দুটি দুলে উঠলো। এক একটা লাশ ফুলে এক একটা মোষের মত হয়ে আছে। মাথা নিচের দিকে, হাত দুটো লম্বা হয়ে ঝুলে আছে।

ঝুলন্ত লাশ দুটি চোখের সামনে দুলে উঠতেই ভেতর থেকে হারিয়ে যাওয়া মানুষটা আবার ফিরে এল। রক্তের ভেতর নিভে যাওয়া সূর্য জ্বলে উঠলো। অমনি রক্ত উঠে এল মাথায়। ঘৃণা এসে তার বুক ফুলিয়ে দিল। ঘাড় টান টান হয়ে গেল। শনিয়ালালের সাকরেদ। সাদা চামড়ার মানুষদের খবর দেবে। তাকেও ঝুলতে হবে গড়হাম

গাছের ডাল থেকে মাথা নিচু করে।

তু খুন কইরলি—একজন বললো। আতঙ্ক বিহ্বল ভয়ে তার গলা কেঁপে গেল।

লোকটি আর দাঁড়িয়ে থাকলো না। হঠাৎ লাফিয়ে উঠে টাঙ্গী বসিয়ে দিল ভীত মানুষটার মাথার মাঝখানে। লোকটা বোধ হয় আবার বিকৃত গলায় বলতে চেয়েছিল, খুন ডালা। মুখ থেকে খুনের বদলে কোৎ করে একটা শব্দ বেরিয়ে এল।

মাথা দু' ফাঁক হয়ে গেল চেরা বাঁশের মত। লোকটা আর কোন শব্দ করতে পারলো না। হাত দুটো তুলে মাথা চেপে ধরতে চাইল। কাঁধ পর্যন্ত হাত দু'খানা উঠে নেতিয়ে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে মুখ থুবড়ে পড়লো রাস্তার উপর। একটা কোয়াক পাখী বিশ্রী গলায় চিৎকার করে উড়ে গেল মাথার উপর দিয়ে।

আরো একজন আছে। সে অন্য মানুষটার দিকে ঘুরে দাঁড়ালো। টাঙ্গী আবার তুললো মাথার উপর। কিন্তু সে লোকটি ভয়ে বিস্ময়ে সম্বিত হারায় নি। টাঙ্গী নিয়ে ঘুরে দাঁড়াতেই পিছন ফিরে দৌড় লাগালো।

সে টাঙ্গী হাতে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল। শনিয়ালালের সাকরেদের পিছন পিছন দৌড়ল না। হাতের টাঙ্গী ছুড়ে মারলো পলাতক মানুষটির দিকে।

হাওয়ার বুক চিরে টাঙ্গী উড়ে গেল। সোজা গিয়ে পলাতক মানুষটির কাঁধের নিচে গেঁথে গেল।

লোকটি দাঁড়ালো না, মাটিতে পড়ে গেল না। যেমন দৌড়ছিল তেমনি দৌড়ে চললো রাস্তা ধরে পিঠে গেঁথে থাকা টাঙ্গী নিয়ে।

দু' দুটো খুন করে সে দাঁড়িয়ে রইল রাস্তার মাঝখানে। পাথর ফেলে তৈরী করা রাস্তার উপর মানুষটি যেন কালো পাথরে খোদাই

করা একটা মূর্তি। তার ভিতরের মানুষটা আবার তাকে ফেলে রেখে চলে গেছে।

সূর্য আরো নিচে নেমেছে। রোদ এখন মর মর। অঝোর ধারায় নীল আকাশ থেকে রোদ নেমে আসছে না। সে দু'দুটো লাশের মাঝখানে শাল গাছের মত দাঁড়িয়ে রইল।

ঘোড়ার খুরের শব্দ ভেসে এল, খট্…খট্…খট্। শব্দ ধীরে ধীরে দূরে মিলিয়ে গেল। কাঁধে বিঁধে থাকা টাঙ্গী নিয়ে অন্য লোকটি তখন ঘোড়ার পিঠে। সে উপত্যকার পথে দ্রুত নেমে গেল। পিঠ বেয়ে তার ঝর্নার ধারার মত রক্ত নেমে আসছে। সে রক্ত দেখতে পাচ্ছে না। ঘোড়ার লাগাম ধরে ঘোড়ার পিঠের ওপরে নিজেকে সাপটে দিয়ে ঘোড়াকে দৌড় করাচ্ছে।

ঘোড়ার খুরের শব্দে লোকটির সম্বিত ফিরে এল। দু'দুটো রক্তাক্ত লাশ তার সামনে। সে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল। অমনি ভিতরের সূর্য নিভে গেল। রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেল এক লহমায়। দেহের সব শক্তি হারিয়ে গেল। ভয়ানক অসহায় মনে হল নিজেকে।

ভয়, ভয় এসে বুকের ওপর চেপে বসলো। কপালে ঘাম ফুটে উঠলো। পরে ঘাম ফুটে উঠলো বুকে। সে দর্ দর্ করে ঘামতে থাকলো।

মনে এল শনিয়ালালের প্রতি তার তীব্র ঘৃণার কথা। মানুষটা ভয়ঙ্কর এক রক্ত চোষা। সাদা চামড়ার মানুষদের পোষা কুকুর। অথচ তার থাবায় বাঘের নখের ধার। একটু একটু করে পাহাড়ী জমি গ্রাস করছিল। সঙ্গে আছে সাদা চামড়ার মানুষ আর তাদের অদ্ভুত কানুন।

দীকু মাত্রেই লোভী আর শয়তান। তারা দল বেঁধে সাদা চামড়ার মানুষদের কুকুর হয়ে গেছে। দীকুরা সমতল থেকে পাহাড়ে উঠে এসেছে। সাদা চামড়ার মানুষেরা কোথা থেকে এল কারো জানা নেই।

গ্রাম প্রধানেরা বলে, সাদা চামড়ার মানুষ এসেছে সমুদ্রের ওপার

থেকে। সমুদ্রে থাকে জল। সমুদ্র কত বড়? সমতলের সবুজ ক্ষেতের মত বিশাল। একের পর এক ক্ষেত চলতে থাকে এবং সব শেষে পাহাড়ের পারে এসে ঠেকে যায়। সমুদ্র কোন পাহাড়ে আটকে যায় না, সে চলতে থাকে....ক্ষেতের পর ক্ষেতের মত জলের পর জল। আবার জল। জলের পরে আবার জল। জল এমনি করে চলতে চলতে অনেক অনেক দূরে গিয়ে আবার মাটি।

সাদা চামড়ার মানুষেরা অনেক জল পাড়ি দিয়ে এদেশে এসেছে। বিশাল এক নৌকোয় চেপে এসেছে। নদীতে যেমন শাল পাতা ভাসে তেমনি ভাসে তাদের নৌকো। একের পর এক চাঁদ ওঠে আর অস্ত যায়। এমনি অনেকগুলি চাঁদ আকাশে উঠে অস্ত যাবার পর সাদা চামড়াদের নৌকো মাটি পায়।

কত দূর দূরান্ত থেকে এসেছে এই সাদা চামড়ার মানুষেরা। অনেক জল পাড়ি দিয়ে তবে এসেছে। প্রথম সমতল তারা দখল করে নিয়েছে। পরে সমতল থেকে উঠে এসেছে পাহাড়ে। তারা তাদের কানুন পাহাড়ে প্রতিষ্ঠিত করবে।

সাদা চামড়ার মানুষেরা যা ভাবে তাই করে। অদ্ভুত ভাষায় কথা বলে। মানুষ সে ভাষা বুঝতে পারে না। দীকুরা বুঝতে পারে। দীকুরা মাথা ঝাঁকায় আর হাত কচলায়। কথায় কথায় হাত সোজা করে কপালে তোলে। হাত কপালে তুললে সাদা চামড়ার মানুষরা খুশি হয়। পা নাচিয়ে শিস্ দেয় আর হাতের চাবুক জুতোর উপর ঠুকতে থাকে।

সাদা চামড়ার মানুষের হাতে আছে বন্দুক। আকোশের বজ্র ঐ লোহার নলের মধ্যে ওরা মন্ত্র পড়ে পুরে রাখে। বন্দুকে একটা টিপ দিলেই এমন শব্দ হয় যে আকাশের মেঘ দু'ফাঁক হয়ে যায়। অমনি বিদ্যুতের ঝলক ঝলসে উঠে এসে ছোবল মারে। মানুষ, জঙ্গলের জানোয়ার এক ঝটকায় মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। আর উঠতে পারে না।

তবু শব্দ থামে না। কানে তালা লাগানো ভয়ঙ্কর শব্দে পাথর

কেঁপে ওঠে। গাছ পালার ওপর দিয়ে গড়াতে গড়াতে পাহাড় ডিঙ্গিয়ে আবার আকাশে চলে যায়।

সাদা চামড়ার মানুষদের সামনে কোন মানুষ দাঁড়াতে পারে না। যে দাঁড়ায় সে লুটিয়ে পড়ে। আর ওঠে দাঁড়াতে পারে না। কত সাঁওতাল, মুণ্ডা, হো সামনে দাঁড়াতে গিয়ে হারিয়ে গেছে তার হিসাব নেই। গ্রাম প্রধানরা বলতে পারে না। কুড়ি তার পর আরো কুড়ি, আবার কুড়ি এমনি হিসাব কষতে কষতে হিসাব হারিয়ে ফেলে।

তাদের পিতৃ পুরুষেরা রুখে উঠেছিল। মরদের মত সাদা চামড়ার মানুষদের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাদের হাতে ছিল তীর, ধনুক, টাঙ্গী আর ঠাকুরের হুকুম।

তবু তারা হেরে গেল। দলে দলে জোয়ান পুরুষেরা মাটিতে কাটা গাছের মত পড়ে গেল। এক জনেও আর ওঠে দাঁড়াতে পারে নি। সে অনেক সময় ভেবে অবাক হয়, কি করে সাদা চামড়ার মানুষরা একের পর এক জোয়ানকে মাটিতে শুইয়ে দিল। গুড়ুম করে শব্দ হল অমনি একটা জোয়ান তীর ধনুক হাতে নিয়ে কাঁটা গাছের মত মাটিতে শুয়ে পড়ল। আবার শব্দ হল গুড়ুম। টাঙ্গী হাতে আর এক মরদ কাত হয়ে পড়ে গেল। এমনি একের পর এক গড়ুম শব্দ হয় আর জোয়ানরা মাটিতে পড়ে। দু' কুড়ি, চার কুড়ি, দু' কুড়ি করে মরদরা পাহাড়ের কোলে পড়ে গেল। তারপর তাদের লাশ পচে গেল। তাদের পচা মাংস থেকে গজিয়ে ওঠল শালের বন সাঁওতাল, হো, মুণ্ডাদের দেহের মত ঋজু, বলিষ্ঠ, উদ্ধত।

এসব কথা সে গাঁও বুড়োদের কাছে শুনেছে।

তিন তিনটে মানুষ খুন হয়ে গেল। তাদের ভিতর অন্যতম শনিয়ালাল।

ঘটে যাওয়া ঘটনা পর্যালোচনা করার মানসিক শক্তি তার নেই। রোদের মধ্যে সে শালগাছের মত দাঁড়িয়ে আছে। এখন ঘামছে,

দর্ দর্ করে ঘাম তার বুক বেয়ে নাভীর পাশ থেকে নেমে যাচ্ছে। সে ভয় পেয়েছে। কি করবে, এখন কি করা দরকার বুঝতে পারছে না, ভাবতেও পারছে না। ত্'তুটো লাশের মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে অতীতের ছবি দেখছে।

একের পর এক ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠছে। ছবি স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠার আগেই আর একটা ছবি এসে পড়ছে। একটা ছবির ওপর আর একটা ছবি····প্রথম ছবি ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে।

শালগাছের মত বিশাল উঁচু দেওয়াল। সাদা চামড়ার মানুষদের তৈরী ফাটক। দরজা এত বড় যেন একটা ভাল্লুক বুক চিতিয়ে প্রতি-পক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। দরজা খোলাই থাকে অজগরের হাঁ করে রাখা মুখের মত। একবার ঢুকে পড়লে আর বেরিয়ে আসা যায় না।

ভিতরে আছে শান্ত্রীর দল। তারা সবই দীকু। হাতে মোটা বেতের লাঠি। ইচ্ছে হলেই কালো মানুষের মাথার উপর মেরে দেয়। মেরে মেরে অনেক কালো মানুষের হাড় গুঁড়ো গুঁড়ো করে দেয়।

হাড়ের গুঁড়ো ফেলে দেয় না। সেই গুঁড়ো দিয়ে সাদা চামড়ার মানুষেরা খাবার তৈরী করে। মানুষের হাড়ের সাদা থক থকে খাবার। সেই খাবার খেয়ে খেয়ে সাদা চামড়ার মানুষেরা আরো সাদা মানুষ হয়। তাদের যৌন ক্ষমতা কমে যায়। সাদা চামড়ার মানুষেরা এসব কথা জানে না। হাড়ের গুঁড়ো খেয়ে শুধু চামড়া সাদা করে। মেয়ে-মানুষকে খুশি করতে পারে না। সাদা চামড়ার মানুষেরা সব সময় মেয়েমানুষদের ভয় পায়। নিজের বৌকে সব সময় তোয়াজ করে। কখনো রেগে দুটো খিস্তি দিতে পারে না। সে সব রাগ, খিস্তি দীকুদের কখনো কালো মানুষদের ওপর উগরে দেয়।

শাল গাছের মত উঁচু দেওয়াল মুছে গেল। গড়হাম গাছের ডালে ঝুলন্ত মানুষের ছবি ফুটে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেল দুটো মানুষের দাঁত কপাটি। মুহূর্তে ঝুলন্ত মানুষ দুটি কঙ্কাল হয়ে গেল।

কয়েকটা পাখী নেমে এল নিচে। লোকটি নড়ছে না দেখে পায়ে

পায়ে শনিয়ালালের লাশের সামনে এল। শনিয়ালালের রক্তে ঠোঁট ডোবালো। মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল একটা শকুন। বিশাল ডানার ছায়া ফেলে একটা পাক খেয়ে উড়ে গেল। বাতস শন্ শন্ করে বাজলো ডানার ঝাপটায়।

শকুনটা ফিরে এল সামান্য সময় পরে। সঙ্গে আরো দুটো শকুন। তিনটে শকুন এক সঙ্গে শন্ শন্ করে পাখা সাপটে ছুটে এল। এবার এল আরো নিচু হয়ে। হঠাৎ দুটি ডানার শব্দে লোকটি কেঁপে উঠল। তখন শুনতে পেল খট্ খট্ শব্দ। উপত্যকা থেকে কলরব উপরে আসছে। কতগুলি মানুষ চিৎকার করছে। তাদের চিৎকার ছাপিয়ে উঠছে ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের শব্দ। ঝড়ের বেগে তারা ধেয়ে আসছে।

দেখা দিল তারা বাঁকের মুখে। হাতে তাদের দীর্ঘ লাঠি। দু' এক-জনের হাতে বর্শা। মানুষগুলি এলো মেলো ভাবে ওপর দিকে উঠে আসছে। তাদের সামনে তিনজন ঘোড়সওয়ার। একজনের হাতে বন্দুক। সে সবার সামনে।

ঘোড়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মানুষগুলো দৌড়ে উঠে আসছে।

মুহূর্তে তার সম্বিত ফিরে এল। ভয়ে বুক চুপসে গেল। মৃত্যু, মৃত্যু ভয় তার গলা চেপে ধরলো। লোকটি আর শাল গাছের মত রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে থাকলো না। এক লাফে সুরি পথের মুখের সামনে চলে গেল। দৌড় লাগালো সুরি পথ ধরে।

সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজ উঠলো। তার কানের পাশে শব্দ হল। লোকটি ধাঁধা খেয়ে গেল। মুহূর্তের জন্য। তারপর দৌড় লাগালো।

কানের পাশ থেকে তীরের ফলার মত আর একটা গুলি বেরিয়ে গেল। লাগলো গিয়ে সামনের মাটিতে। লাল মাটির মধ্যে গেঁথে গেল। এক খাবলা মাটি এসে লাগলো মানুষটার মুখে। পা হড়কে সে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

পেছনের হৈ চৈ আবার শুনতে পেল। বল্লম, বর্শা বন্দুক নিয়ে ছুটে আসছে কতগুলো মানুষ। তাকে ধরতে আসছে।

সে এক ঝটকায় উঠে দাঁড়ালো। নাক ফেটে রক্ত গড়িয়ে নেমে এসেছে। সে টের পেলনা। একটা লাফ মেরে পাশের জঙ্গলের মধ্যে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়লো। গুড়ি মেরে শেয়ালের মত নিবিড় জঙ্গলের মধ্য দিয়ে খানিকটা পথ এগিয়ে গেল। এবার বড় গাছের সারি, একের পর এক গাছ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সে বিশাল গাছগুলোর ফাঁক ফোঁকর দিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় লাগালো।

॥ ০২ ॥

অরণ্য ক্রমশ গভীর থেকে গভীর হচ্ছে। আলো কমে যাচ্ছে। অন্ধকার দু'বাহু দিয়ে তাকে জাপটে ধরার জন্য দ্রুত ধেয়ে আসছে। সে দাঁড়ালো না। কে যেন পেছন থেকে তাড়া করছে—সে দৌড়চ্ছে।

তার চারপাশে এখন বিশাল বিশাল গাছ মাটি ঠেলে উঠে উদ্ধত ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। সবুজ পাতার পর পাতা সাজিয়ে আকাশ আড়াল করে রেখেছে। মাঝে মাঝে বিশাল উইয়ের ঢিপি। দৈত্যের মত কালো পাথর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। বিশাল বিশাল কালো ভাল্লুক যেন দাঁত দিয়ে মাটি কামড়ে ধরে আছে।

এখনো সে দৌড়চ্ছে। অন্ধকারের মধ্যে কালো রংয়ের মানুষটিকে আর মানুষ বলে চেনা যাচ্ছে না। একটা কালো ছায়া পাগলের মত জঙ্গলের মধ্য থেকে মোটা গাছের ফাঁক ফোঁকর দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে। থামতে চেয়েও থামতে পারছে না। কাঁটার আঁচড়ে সারা গা ক্ষত বিক্ষত। নাক দিয়ে রক্ত নেমে আসা বন্ধ হয়েছে। সে কোন জ্বালা যন্ত্রণা টের পাচ্ছে না। সামনে তার একটাই লক্ষ্য—গভীরতর বন।

কানের মধ্যে গুলির শব্দ পিছনে কতগুলো মানুষের কলরব।

অথচ বন এখানে স্তব্ধ। তবু তার কানের মধ্যে কতগুলো এলো মেলো শব্দ। শব্দ তার বুকের খাঁচা খামচে ধরছে। অমনি সে সন্ত্রস্ত হয়ে দৌড়চ্ছে। দৌড়ে দৌড়ে শক্তি সামর্থ এখন নিঃশেষ।

তার ভিতরের মানুষটা আর নেই। বাইরের মানুষটা জীবনীশক্তি মুঠো মুঠো ক্ষয় করে প্রায় নিঃশেষ করে এনেছে। আর তেল নেই। যে কোন মুহূর্তে প্রদীপ দপ্‌ করে নিভে যেতে পারে।

অরণ্য-পুরুষ অত সহজে প্রদীপ নেভায় না। রক্তে আছে অরণ্যের গোপন সতেজ শক্তি, সেই শক্তি তাকে প্রতি মুহূর্তে শক্তি যোগান দিচ্ছে।

এ বন ভয়ঙ্কর বন। ডালপালায় আর সবুজ পাতায় গভীর। তার তলায় ঘুরে বেড়ায় বাঘ। নেকড়ে ফাঁদ পেতে বসে থাকে শিকারের আশায়। দাঁতালো শূকর গাছের নিচে ঘুরে বেড়ায়। থেকে থেকে ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করে। হাতীর দল আসে মুগুরের মত পা ফেলে ফেলে। তারা কখনো দল বেঁধে গ্রামের কাছে চলে যায়। দল বেঁধে ধানের ক্ষেতে নেমে পড়ে। তখন গাঁয়ের মানুষরা টিকারা, ধামসা পিটোয়। বাঁশে বাঁশ ঠুকে বিকট শব্দ তোলে। হাতি ভয় পেয়ে জঙ্গলে ফিরে যায়।

বাঘ হল্লার মুখোমুখি হয়ে ভয়ে পালায়। একেবারে পালায় না, আবার আসে। পাথরের পাশে নিঃশব্দে বসে থাকে শিকারের প্রত্যাশায়। শাল গাছের ডালে থাকে বিশাল ময়াল। মনে হবে ঝুলে আছে গাছের শুকনো ডাল। মুহূর্তে শুকনো ডাল সজীব হয়ে উঠতে পারে। আস্টে-পৃষ্টে জড়িয়ে ধরবে মরণ বাঁধনে।

না, এ সব বিপদের কথা লোকটির মাথায় আসছে না। হাতে কোন অস্ত্র নেই। শূন্য হাতে গভীর বনের মধ্য দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে— মৃত্যুভয় তাকে মরিয়া করে তুলেছে।

মৃত্যুকে ফাঁকি দিতে গিয়ে এখন সে মৃত্যুর থাবার মধ্যে।

আর দৌড়তে পারছে না। এবার তাকে থামতেই হবে। পা এখন ক্লান্তিতে ভারী। বুক হাপরের মত ওঠা নামা করছে। নাকের ফুটো

দিয়ে আগুন বেরিয়ে আসছে। এখন সে মুখ খুলে হাঁ করে আছে। হাঁ করে জোরে জোরে বাতাস টানছে। বাতাস কিন্তু এখানে স্তব্ধ। বাতাসের জন্য বুকের ভিতর আকুপাকু করছে।

একটা শালগাছে পিঠ ঠেশ দিয়ে দাঁড়ালো। চোখ বন্ধ করে বাতাস গিলে খাচ্ছে। খানিকটা বাতাস গিলে সে চোখ খুলে দেখতে পেল উইয়ের ঢিপি। তার সামনেই বিশাল উইয়ের ঢিপি ভাল্লুকের প্রিয় খাদ্য। উইয়ের ঢিপি ভেঙ্গে খায় আবার রাতারাতি ঢিপি গজিয়ে ওঠে। সে এখন ভল্লুকের খাদ্যের সামনে।

সে এবার হাঁটতে শুরু করলো। উইয়ের ঢিপি থেকে অনেক দূরে সরে যেতে হবে।

বন এখন পাতলা। কত পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে মানুষটি নিজেই জানে না। গভীর জঙ্গলে কোন হিসাব, দিন রাত্রির ফারাক সব সময় স্পষ্ট নয়। জঙ্গল আপন রাজ্যে আপনি সম্রাট। তার নিয়ম কানুন আলাদা, তার সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ সামান্য। সেই সামান্য যোগা-যোগ মানুষটির আছে। বনের মধ্যে ও পথ হারাবে না।

সে বন আর এ বন এক বন নয়। মানুষটাও আলাদা। ভিতরের মানুষটা আবার ভিতরে ঢুকে পড়েছে। বাইরের মানুষটা প্রাণের ভয়ে মরিয়া হয়ে দৌড়েছে। পথের হিসাব, নিশানা কোন কিছু রাখেনি।

দৌড়ে দৌড়ে সে গভীর বন থেকে একটা হাল্কা বনে এসে পড়েছে। তার বুকের শক্তি নিঃশেষ। একটু বাতাসের জন্য বুক হাঁকপাঁক করছে। সারা গা ঘামে ভেজা। দম নিতে পারছে না। একটা গাছে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাথা পিছন দিকে হেলিয়ে রেখেছে। আকাশ থেকে হাওয়া গিলে খেতে চাইছে।

পা, বুক, হাত ক্ষত বিক্ষত। মুখ এখন বোয়াল মাছের মত হাঁ হয়ে আছে। নিঃশ্বাস নেবার তাগিদে শরীর কুঁজো হয়ে আবার শরীর খাড়া হয়ে যাচ্ছে। শরীর থেকে থেকে ছোট হচ্ছে আবার ছোট থেকে বড় হয়ে উঠছে।

সে আর দেহের ভার ধরে রাখতে পারছে না। গাঁটের কাছ থেকে পা ভেঙে পড়তে চাইছে। হাত দুটো দিয়ে গাছের গুঁড়ি আঁকড়ে ধরে আছে। কিন্তু হাত পিছলে নেমে এসে দু'পাশে ঝুলছে। এখন হাঁটুর উপর হাত রেখে নিজের হাতকে নিজের হুকুম তালিম করতে বলছে। হাত আর হাঁটুর ওপর থাকতে চাইছে না। প্রতিবার হাওয়া গিলতে গিয়ে খাবি খাচ্ছে। চোখের উপর কালো পর্দা ঝুলছে, কালো পর্দা কাঁপতে কাঁপতে সরে যাচ্ছে। আবার চোখের ওপর ফিরে আসছে। তার দেহ ক্রমশ নুয়ে পড়ছে। মাথা বুকের উপর নেমে এসেছে।

সে আরো নুয়ে এল। টাঙ্গীর কোপে একটা গাছের মত মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। অরণ্যের গভীর ঘন অন্ধকারে তার চৈতন্য তলিয়ে গেল।

চেতনা ফিরে এল মানুষটির। আকাশে চাঁদ উঠেছে। চাঁদের আলো পাতা বেয়ে নেমে এসেছে। সে প্রথম অবাক চোখে তাকিয়ে রইল নতুন দেশের দিকে। একে একে মনে পড়লো সব।

চোখ খুলে রাখতে পারলো না। ঘুম নেমে আসছে চোখের পাতায়। অন্ধকার রাত্রি পার হয়ে চললো। সে লম্বা হয়ে পড়ে আছে বনের মাটিতে যেন শালগাছের ডাল ভেঙ্গে পড়ে আছে। রাত্রে তার শরীরের উপর দিয়ে এক ঝাঁক জোনাকী ঘুরে বেড়িয়েছে। এল একটা ইঁদুর তার দু হাঁটুর ফাঁকে আড়াল নিল। লম্বা একটা পাহাড়ী সাপ তার পিছনে পিছনে। ইঁদুর হাঁটু বেয়ে নিচে নেমে দৌড় লাগালো। দীর্ঘকায় সাপ মানুষটির পায়ের কাছ থেকে বেরিয়ে গেল দ্রুত।

তিন তিনটে হরিণ এল। তারা থমকে দাঁড়ালো মানুষটার সামনে। একটা হরিণ মাথা নিচু করে গন্ধ শুকলো। বিশ্রি অপরিচিত এক গন্ধ এসে নাকে লাগলো। বিরক্ত হয়ে নাকে সে ফ্যাচ্ করে একটা শব্দ করে দৌড় দিল। অন্য হরিণ দুটি তার সঙ্গী হল। শেষ হরিণটি তাকে লাফিয়ে পার হয়ে গেল। পায়ের খুর হাঁটুতে লেগে গেল।

হঠাৎ আঘাতে মানুষটি জেগে উঠলো। এতক্ষণ সে একটা স্বপ্ন দেখছিল। একটা লাল গরু এসে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। মাথায় দুটো ধারালো শিং। গরুটাকে চেনা চেনা মনে হল। তাদের গোয়াল ঘরে থাকতো! তখন সে ছোট বলে গোয়াল ঘরে ঢুকতো না। বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতো লাল গরুর জাবনা খাওয়া। লাল গরু ঘাড় দুলিয়ে দুলিয়ে জাবনা খাচ্ছে। গলায় দড়িতে কাঠের টুকরো আর কড়ি বাঁধা। কাঠের সঙ্গে কড়ি লেগে সুরেলা আওয়াজ হত, তার বড় ভালো লাগতো।

লাল গরুর পাশে থাকতো একটা কালো গরু। সে গরুটা ছিল বুড়ো। জাবনা খেত ধীরে ধীরে। অনেক সময় বসে থাকতো চোখ বন্ধ করে। জাবর কাটতো। কানের উপর মাছি বসলে মাথা নাড়তো না। চোখ বন্ধ করে কালো গরুটা বোধ হয় পিতৃপুরুষের কথা ভাবতো।

একদিন জমিদারের পেয়াদা এল। পেয়াদা এসে লাল গরুটাকে গোয়াল ঘর থেকে খুলে নিয়ে গেল। তার বাবা মা দু'জনে নীরবে দাঁড়িয়ে ছিল। গরু নিয়ে যাওয়া দেখছিল। তার বাবা পাথরের মত দাঁড়িয়েছিল। লোক দুটো গরুটাকে নিয়ে চলে গেল। পথের বাঁকে গরু আড়াল হতেই মা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিল।

সে গরু আর ফিরে আসেনি। সেই লাল গরু এতদিন বাদে এসে তার মাথার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। প্রথম তার পানে তাকিয়ে থাকলো খানিক সময়। তারপর লাল গরু মাথা নিচু করলো। লম্বা জিভ বের করে তার কপাল চেটে দিল। সঙ্গে সঙ্গে সে হাঁটুতে হরিণের পায়ের চাট খেল।

ঘুম ভাঙ্গতেই স্বপ্ন হারিয়ে গেল। স্বপ্নে কি দেখলো তা মনে করতে চাইলো মনে করতে পারলো না। উঠে বসতে চাইলো ওঠা হল না। গায়ে তীব্র বেদনা। হাজার হাজার মৌমাছির দল তাদের তীক্ষ্ণ হুল দিয়ে মানুষটাকে বিদ্ধ করছে। পায়ের গাঁট দুটো টাটাচ্ছে। কে যেন গাঁটের উপর পাথর রেখে ঠুকছে। গাঁটের গোল চাকা চাকা হাড়

দুটোকে গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিতে চাইছে। সে হাঁটু দুটোকে টানলো! পা ভাজ করতে পারছে না।

অমনি সে ক্ষেপে গেল। নিজের পা সে নিজে ভাজ করতে পারবে না? সে জোর করলো। অমনি পা ভাজ হল। এবার সে পা ভাজ করে কোমরের মধ্যে পা দুটোকে ঢুকিয়ে দিল। অমনি লাল গরুটাকে দেখতে পেল। শিং বাঁকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সামনের পা দুটোকে খুঁটি করে। গোয়াল ঘর থেকে বেরিয়ে যাবে না। জমিদারের পেয়াদাকে সে চেনে না।

গোয়াল ঘর থেকে লাল গরু বেরিয়ে এল। ওমনি তার পা দুটো পুরো ভাজ খেয়ে হাঁটুর মধ্যে ঢুকে গেল।

এখন সে আধো ঘুম আধো জাগরণের মধ্যে। চেতনায় দিন রাত্রির কোন পাথক্য নেই। কোন ভাবনা চিন্তা মাথায় আসছে না। ফাঁকা মাথা নিয়ে শুয়ে আছে তাও নয়। মস্তিষ্কের গোপন কোষে প্রদাহমান এক রকমের যন্ত্রণা টের পাচ্ছে। বিদ্যুৎ চমকের মত যন্ত্রণা হানা দিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে।

তবু তার মাথা শূন্য। মাথার ভিতরে অদ্ভুত শূন্যতা অবাক করে দিল। তার কাস্তেখানা দেখতে পাচ্ছে না। লাঙ্গলের ফলা কি রকম দেখতে তা আর মনে করতে পারছে না। ঘর? না। বস্তী? না। বাপের মুখখানা কি রকম? শশার মত শুকিয়ে গিয়েছিল? মনে করতে পারছে না। কোথায় সব হারিয়ে গেল?

দুই চোখে গাঢ় ঘুমের পর্দা আবার নেমে এল।

দুটো হাত শক্ত করে পিঠে বেঁধে দিয়েছে। তারপর গরু টেনে নেবার মত করে তাদের লোকগুলো টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তার বাবা হাটতে পারছে না, তাকে প্রায় গড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সে গল্ গল্ করে ঘামছে। বুকের মধ্যে আগুন জ্বলছে কিন্তু কিছু করতে পারছে না।

নিজেকে একটা বধ্য শুকর বলে মনে হচ্ছে। হাত পা বাঁধা হয়েছে এবার আগুনে ঝলসানো হবে।

তারা হাঁটছে তাদের সামনে শনিয়ালাল রাগে ঘোঁত ঘোঁত করছে আর মাঝে মাঝে পিছন ফিরে তাকাচ্ছে।

তারপর সেই অন্ধকার কুঠরী। তারা দু'জনে বসে আছে মুখোমুখি। দু'জন দু'জনকে দেখতে পাচ্ছে না। ঘরটা একটা উনানের মত গরম। গা বেয়ে ঘাম নামছে—তারা দু'জনে একটু দূরে দূরে বসে কুল কুল করে ঘামছে। গায়ের রক্ত আর থাকবে না। সব রক্ত জল হয়ে নেমে যাবে। বুঝতে পারছে কিন্তু কিছু করতে পারছে না। তারা অন্ধকার ঘরে বন্দী। ঘর অন্ধকার। তাদের মুখে কোন কথা নেই।

দু'দিন দু'রাত কখন পার হয়েছে জানতে পারে নি। তারা ছিল গভীর অন্ধকারের মধ্যে। সেই অন্ধকারে হতে হঠাৎ চোখ আরো অন্ধকার করে দিতে এক ঝলকা আলো এল। তখন সে দেখতে পেল বুড়ো মানুষটাকে। দেয়ালের পাশে পড়ে আছে। কাত হয়ে শুয়ে আছে ফুলে ওঠা লাশের মত। চোখ দুটো সাদা। মুখ হাঁ করে আছে। জিভ বেরিয়ে এসেছে বাইরে।

দৃশ্য মিলিয়ে গেল। সে জেগে উঠলো। জেগে উঠে পা দুটোকে লম্বা করলো। টান টান করে মেলে দিল। ঝনঝন্ করে তীব্র এক বেদনা মাথার মাঝখানে ছোবল দিল। ছোবল দিয়েই হারিয়ে গেল. অথবা সারা শরীরে ছড়িয়ে গেল। এখন নিজের ভিতর সেই বেদনা অনুভব করতে পারছে।

এবার মানুষটি চোখ খুললো। দেখতে পেল সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে আঁকা বাঁকা ডাল। এবার চোখ সরিয়ে দেখতে পেল গাছ। কেন্দ্ গড়হাম, শিমুল গাছ পর পর দাঁড়িয়ে আছে। তার পাশে কালো মোষের মত বিশাল এক পাথর। পাথর বেয়ে উঠেছে বন্য লতা। আর তার পিছনেই জঙ্গলা গাছ।

দৌড় লাগাবার কথা মনে এল। অমনি চোখের সামনে ভেসে

উঠলো শনিয়ালাল। লোকটা কাত হয়ে রাস্তার ওপর পড়ে আছে। গলায় কাছে টাঙ্গী বিঁধে আছে আর একটা লোক এসে দাঁড়ালো শনিয়ালালের লাশের পাশে। ছগন। ছগনের মাথায় টাক রোদ পড়ে টাক চক চক্ করছে। সরু ক্ষুর কাটার মত গোঁফ নাকের নিচে। গায়ে একটা ফতুয়া। লোকটার মাথার টাকের মাঝখানে টাঙ্গীর ফলা গেঁথে আছে

চমক ভেঙ্গে। সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসলো মানুষটি থুথু ফেললো মাটিতে। বিড় বিড় করে বললো তু ক্যানে আইলি সামনে? তারপর সে হাসলো। মনে মনে ভাবলো, একজনকে বাঁচাতে গিয়ে আর একজন মরে এই গ্রামে যেমন শনিয়ালালকে খুন করলাম, হ্যাঁ অনেক সাঁওতালের জান বাঁচিয়ে দিতে। সাঁওতাল কুড়িগুলো এবার যুবতী হয়ে হোপনদের স্বপ্ন দেখতে পারবে গাঁয়ের পথে পথে তারা গুণ গুণ করে গান করবে—"নিঞ দঞ চালাং ঘাড়া গাড়াতে এদিক ওদিক ঘুরি, ঘুরি নদীর পারে। তুমি এক দিন হঠাৎ নেমে এলে পাহাড় থেকে। পাহাড় থেকে নেমে এসে আলিঙ্গন দিলে

কোড়াম তেগাবেম চাপে। কিদিঞ

বুলু চ বতে বেবেল মাতগাগেন চাপে ক দিঞ ন

বুক দুটিকে তুই দিলি মরদ হাতে চাপন তারপর সে গানের কথাগুলি আর মনে আসছে না সে বিরক্ত হয়ে আবার থুথু ফেললো। এবার তার পরের কথাগুলো মনে এল—ডাহা থেকে বস্তু গুয়ে দিলে।

নিজের ভিতর এক রকমের আত্মপ্রসাদ অনুভব করলো। সে এমন একটা কাজ করেছে যা একটি মরদের করার মত কাজ। অবশ্য পরিণাম যে কি ভয়ঙ্কর তা সে জানে তাই বলে সে পিছিয়ে আসেনি খতনার পাহাড়ী চিতাটাকে একেবারে শেষ করে দিয়েছে

আবার সে নিজেকে শুনিয়ে বিড় বিড় করে বললো, এবার তুই নিজে শেষ হবি

কোন দুঃখ নিজের ভিতর অনুভব করলো না।

সে চুপচাপ বসে আছে। নানান কথা মাথার মধ্যে আসছে। সে ভাবতে চাইছে তা নয়, আপনা থেকে ভাবনাগুলি জলের বুরুক কাটার মত উঠে আসছে।

এখন মনে পড়ছে ছুটিয়ার কথা। করোঞ্জ তেলমাখা মুখখানা যেন অনেক দিন বাদে আবার দেখতে পেল। তেজী মুরগীর মত বুক দুটো ফুলিয়ে মাঠের পথে নেমে যাচ্ছে। মাথার চুলে একটা লাল ফুল। একটা তেজী ডাকাবুকো মোরগের বুকের নিচে শুয়ে মোরগটাকে ঠোঁট দিয়ে ঠুকরে ঠুকরে পাগল করে দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। এখন সেই তেজী মোরগটাকে খুঁজছে।

সেই মোরগটা পাহাড়ের পাশের জমিতে মোষ নিয়ে বসে আছে। তার পাশে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে একখানা টাঙ্গি। মোরগটা খেপে আছে। আপন মনে বিড় বিড় করছে, খাজনা তুব্ব, খাজনা তুব্ব, জমি কি তুর অমপুব ? মোদের দিশামে তুদের ঠাঁই লাই, হ।

সুখন হল সেই মোরগ।

তার মন খারাপ হয়ে গেল। ব্যথায় বুক টন্ টন্ করে উঠলো। চোখের সামনে ভেসে উঠলো সুখনের লাশ। গাছের ডাল থেকে মাথা নিচু করে ঝুলে আছে। বুকের কাছটায় কতগুলো লাল ফুল ফুটে আছে। ফুলগুলো গলে গলে নিচের পাতার উপর পড়ছে।

কয়েকটা সাদা চামড়ার মানুষ ঘোড়ার পিঠে বসে আছে। তাদের কাঁধে বন্দুক। ধাতব উজ্জ্বলতায় তাদের চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। ঘোড়া-গুলি বার বার মাটিতে পা ঠুকছে। বন্দুকধারী সেপাইদের সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শনিয়ালাল। বিশাল গোঁফের মোচর মারছে আর বলছে, তুরা সাবোধান হয়ে যা। সাহাবদের কুথা শুন।

গভীর রাত্রে ছুটিয়া গিয়েছিল লাশটাকে নামিয়ে আনতে, পারেনি। সাদা চামড়ার মানুষদের দীকু সেপাইরা মশাল জ্বেলে পাহাড়ায় ছিল।

চার চারটে সূর্য অস্ত যেতে আবার এল শনিয়ালাল। সঙ্গে জমিদারের নায়েব আর পাইকার। জমিদারের নায়েব বললো, খাজনাটা

দে। গাঁয়ের বুকে লাল নিশান পুঁতে দিল। পাঁঠা, মুরগী নজরানা আদায় করলো। যাবার সময় সিঁদুর মাখানো লাল খাতার খত দেখালো।

সুদের টাকা না মেটাতে পেরে গোটা পরিবার শ্রমদাস হয়ে গেল। গাঁ ফেলে শনিয়ালালের পেছন পেছন চলে গেল শনিয়ালালের বাড়ী। ছুটিয়ার উদ্ধত বুক তখন ভয়ে, দুঃখে একটা বেলের কুঁড়ি হয়ে গেছে।

শনিয়ালালের বাড়ী থেকে তারা সবাই গাঁয়ে ফিরলো কয়েক কুড়ি দিন বাদে। সবার পিছনে মাথা নিচু করে বাইরে বেড়িয়ে এসেছিল ছুটিয়া। পেট তখন ফুলে গেছে। শনিয়ালাল তার সুখ যা করার করে নিয়েছে।

তার রক্ত আবার গরম হয়ে উঠছে। ভিতরের মানুষটা আবার বাইরে এসে চোখের সামনে লম্বা হয়ে শুয়ে থাকতে চাইছে।

সে সুযোগ হল না। তার আগেই ঘোড়ার খুড়ের শব্দ শুনতে পেল। অনেক দূর থেকে কতকগুলো ঘোড়া ছুটে আসছে।

সে সামনের দিকে তাকালো। সামনে একটা সুড়ী পথ। আঁকা বাঁকা হয়ে গভীর অরণ্যের মধ্যে চলে গেছে। তার পেছনে একটা পায়ে চলা রাস্তা। মানুষের হতে পারে আবার জানোয়ারের চলার পথ হতে পারে। সবুজ পাতার আড়াল থেকে দেখা যাচ্ছে পথের শেষ। পথের শেষ প্রান্তে আলো। আলো একটা লাল চাতালে এলিয়ে আছে। পায়ে চলা পথের শেষ প্রান্তে যে রাস্তা মানুষটি তা জানে না।

ঘোড়ার পায়ের শব্দ তীব্র হল। এখন ঘোড়ার খুরের শব্দ অনেক স্পষ্ট। একদল ঘোড়া খুরের ঘায়ে ধূলো উড়িয়ে ধেয়ে একটা নয় আসছে।

তারা এলো। পথের শেষ প্রান্তে তাদের দেখা গেল। ঘোড়ার পিঠে বসে আছে সাদা চামড়ার মানুষ। মাথার ওপর বাঁকা টুপি। কাঁধে বন্দুক। রোদ পড়ে বন্দুকের কুঁদো ঝক্ ঝক্ করে জ্বলছে।

একের পর এক আসছে। মানুষটি বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল।

ঘোড়ার খুরের শব্দ হাতুড়ির মত এসে মাথার মধ্যে আঘাত করছে। তার ভিতরের মানুষটা আর নেই। বাইরের মানুষটা বসে আছে। তার বুক কাঁপছে। ঘোড়াগুলো যেন তার বুকের মধ্যে পা ফেলে দৌড়চ্ছে। তাদেব খুড়ের চাপে বুকের হাড় পাজরা গুড়ো গুড়ো হয়ে যাচ্ছে।

আবার শনিয়ালালের মুখ দেখতে পেল। তার চোখের সামনে কাত হয়ে পড়ে আছে। চোখ দুটো খোলা। চোখ দুটো শয়তানের চোখ হয়ে জ্বলছে। সে ঘাবড়ে গেল। শনিয়ালালের বিদেহ শরীব তাব পিছনে পিছনে এসেছে। মৃত মানুষ কখনো কখনো খুনী মানুষের পিছনে পিছনে চলতে থাকে। শনিয়ালাল তার সঙ্গে আছে।

সাদা চামড়ার মানুষদের সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। একের পর এক সাদা মানুষ ঘোড়ায় চেপে ছুটছে। তাকে ধরবার জন্য একটা বৃত্ত রেখা তৈরী করেছে মাছের মত। টোপের চার পাশে ঘুর পাক খেয়ে হঠাৎ লাফিয়ে টোপ কামড়ে ধরবে।

সে এখন সাদা চামড়ার মানুষদের টোপে পরিণত হয়ে বসে আছে। আর তাকে ধরবার জন্য বেরিয়ে পড়েছে সাদা চামড়ার মানুষরা।

তাকে খুজছে সাদা চামড়ার মানুষরা। শনিয়ালাল তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছে। সে ভয় পেয়ে কেঁপে উঠলো। হাত পা হঠাৎ অসার হয়ে গেল

জঙ্গল মহলের শেষ প্রান্তে উড়িষ্যার প্রান্তসীমার আদিবাসীরা বিদ্রোহ করেছে। তারা সাদা মানুষদের কানুন আর মানবে না। দিনের পর দিন এক একটা কানুন জারী করছে সাদা চামড়ার মানুষরা। সেই কানুন হাতে নিয়ে আসছে দীকুরা। সুযোগ পেয়ে দীকুরা কালা মানুষদের রক্ত শুষে খেয়ে নিচ্ছে। মেদিনীপুরের মাঠে যারা চাষ করে নগদে কয়েক টাকা পেত তারাও শোষণ থেকে রেহাই পাচ্ছে না। সমতলে নামলেই সেপাইরা ধরে নিয়ে আটক করে রাখে। এক টাকা

করে আদায় করে তবে মুক্তি দেয়।

সবাই বিগড়ে গিয়েছে। সাদা মানুষদের কানুন মানবে না। বংশ-পরম্পরায় ভোগকরা জমির বাড়তি খাজনা দেবে না। জমিদার সাদা চামড়ার মানুষদের হয়ে আবার নতুন করে করের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। নিত্য নতুন কানুন এসে তাদের মাথার ওপর চেপে বসছে। জঙ্গল তাদের বাপ মায়ের মত। দু' হাত ভরে সন্তানদের দেয়, বিনিময়ে সে কিছু নেয় না।

সেই জঙ্গল আদিবাসীদের হাত গলে চলে যাচ্ছে দীকুদের হাতে। সমতলের মানুষ উঠে আসছে পাহাড়ে। একের পর এক জমি কেড়ে নিচ্ছে। জমিতে ফসল বুনলে খাজনা চাইছে। না দিলে হাতে দড়ি বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে সাদা চামড়ার মানুষদের কাছে।

ক্ষোভ ধুমায়িত হতে হতে এখন বিদ্রোহ। ইংরেজ সেপাইরা ঘোড়ায় চেপে ছুটছে বুটের চাপ দিয়ে বিদ্রোহ থেতলে দিতে।

এ সব কথা মানুষটি জানে না। সে ভাবলো তাকে ধরে নিতে বেড়িয়ে পড়েছে সাদা চামড়ার মানুষের দল। সে ভয় পেল। সঙ্গে সঙ্গে আত্মরক্ষার কথা মনে এল। শরীরের বেদনার কথা ভুলে গেল। এক ঝটকায় উঠে দাঁড়ালো। গুড়ি মেরে চলে গেল শাল গাছের আড়ালে।

শাল গাছ ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে চাইছে। এখন দাঁড়িয়ে থাকা কঠিন। পা দুটো কাঁপছে। হাত গাছের শরীর থেকে পিছলে নেমে যেতে চাইছে। সে প্রাণপণ শক্তিতে গাছ আঁকড়ে ধরে রাখতে চাইছে।

ঘোড়ার খুরের শব্দ কি শেষ হবে না! আকাশে রোদ! তীরের ফলার মত রোদ এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে গাছের পাতায়। পাতাগুলো চক্ চক্ করছে বাঘের চোখের পটলের মত। মাঝে মাঝে পাতা সরে যেতেই লম্বা রেখায় রোদ নিচের দিকে নেমে আসছে। মাটির উপর বাঘছাল তৈরী করে মিলিয়ে যাচ্ছে।

ঘোড়ার খুরের শব্দ দূরে মিলিয়ে গেল। আবার আরণ্যক নিস্তব্ধতা নেমে এল। পাখীগুলো ডাকছে না। ঘোড়ার খুরের শব্দে ভয় পেয়ে

মূক হয়ে আছে।

বন স্তব্ধ হয়ে থাকাতে ভয় আরো বেড়ে গেল। দম বন্ধ হয়ে আসছে। চোখের সামনে ভাসছে সাদা চামড়ার মানুষরা। একের পর এক মুখ লাল করে দাঁড়িয়ে আছে। কাঁধে বন্দুক। পায়ে গোড়ালী পর্যন্ত ঢাকা চামড়ায়। সুন্নুর হাত মাড়িয়ে ধরেছে। সুন্নু কলে পড়া ইঁদুরের মত ছট্‌ফট্ করছে। যন্ত্রণায় মুখ নীল হয়ে উঠেছে। সাদা চামড়ার মানুষটা যন্ত্রণা কাতর মুখ দেখছে আর পা বগড়াচ্ছে। অদ্ভুত ভাষায় থেকে থেকে খিস্তি আওরে যাচ্ছে। শনিয়ালাল সাদা মানুষটার পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

শনিয়ালালের গোঁফে হাত। হাত দিয়ে বিশাল গোঁফ দুটির প্রান্ত-সীমা পাকিয়ে পাকিয়ে সূচালো করছে। তাদের পানে ফিরেও তাকাচ্ছে না বেজন্মার বাচ্চা। সাদা মানুষটা একটা মোষের মত মুখ করে তাকিয়ে আছে। সুন্নুর হাত থেতলে যাচ্ছে। রক্ত দেখা যাচ্ছে। সাদা চামড়ার মানুষটা সুন্নুর হাতের রক্ত দেখছে। রক্ত দেখে আরো খেপে গেল সাদা চামড়ার মানুষটা। একটা রাগী মোষ হয়ে যাচ্ছে। থেকে থেকে পায়ের উপর চাপ দিচ্ছে। সুন্নুর হাতখানা ছিড়ে না নিয়ে সাদা চামড়ার মানুষটা থামবে না।

শনিয়ালাল কিছু বলছে না। সাঁওতালরা অসহায় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কুকুরের মত মুখ করে। গলায় তৃষ্ণা। ভয়ে তড়িতাহত মানুষদের মত সুন্নু কাঁপছে। দর দর করে ঘামছে, ঘাম মুখ বেয়ে নিচের দিকে নামছে। মুখ বিকৃত। চোখ দুটো বিস্ফারিত। তীব্র যন্ত্রণা দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করতে চাইছে।

সুন্নু সাদা চামড়ার মানুষটার বোতলটা ভেঙ্গে ফেলেছে। অমন সুন্দর বোতল তারা কখনো দেখেনি। সাদা বোতল চক্ চক্ করছিল। বোতলটার ভিতর থেকে বোতলের ওপার দেখা যাচ্ছিল। বোতলের মধ্যে ছিল লাল মদ। করোঞ্জা ফুলের মত ঝক্ মক্ করছিল।

সুন্নু বোতলটা হাতে নিয়ে দেখছিল আর চোখে আলোর চমক

পায়ে হাঁটে। গাছের ডাল থেকে ঝোলে অজগর।

অরণ্য ভয়ঙ্কর কিন্তু সুন্দর। পায়ে পায়ে মৃত্যুর ফাঁদ পেতে রেখেও সে সুন্দর। রহস্যময়। সে দেয় আবার কেড়েও নেয়।

সে এখন অরণ্যের অনেক ভিতরে চলে এসেছে। ভাবছে, এখন সে কি করবে বা কি কি করতে পারে। লোকালয়ে আর ফিরে যাবে না। সাঁওতালরা ভয়ে সাদা চামড়ার মানুষ আর দীকুদের পোষা কুকুর হয়ে গেছে। যারা কুকুর হয়নি তারা দাঁতে দাঁত লাগিয়ে সব রকমের অত্যাচার সহ্য করে যাচ্ছে।

মেয়েদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে। তারা বেগার খেটে রাস্তা তৈরী করে আর কুমড়োর মত পেট ফুলিয়ে ফিরে আসে। জুটো মরগী নিয়ে পঞ্চ-প্রধান চুপ হয়ে যায় ভয়ে। এই কি সমাজ ?

আকাশে সিংবোঙা আর নিচে পঞ্চ—এ সব কথা এখন আর সাঁওতালরা শুনতে চাইছে না। সবাই টাকা চাইছে। টাকার জন্য দীকুদের বাড়ী গিয়ে কাজ করছে। অনেকে যাচ্ছে সাদা চামড়ার মানুষদের কাছে। মাথায় কাপড় বেঁধে ট্যাকে টাকা নিয়ে ফিরে আসছে। জমি চাষ করার কথা ভুলে থাকছে।

তু কুথাকে যা'ব ? সে নিজেকে নিজে প্রশ্ন করলো। তাকালো পাশে। না, ভিতরের মানুষটা বাইরে আসে নি। এখন নিজেকে নিজের প্রশ্নের জবাব দিতে হবে।

বস্তীতে আর ফিরে যাবে না। সে যাবে না আর মানুষের মধ্যে। একা বনের মধ্যে থাকবে। সে মাথা নাড়লো। ফিরে যাওয়া মানে সাদা চামড়ার মানুষদের গুলির মুখোমুখি দাঁড়ানো। শনিয়ালালের সাকরেদরা ধরতে পারলে টাঙ্গী দিয়ে কোপাবে। হয়তো একটা কোপ মেরে এক খানা পা খসিয়ে দেবে। আগুনে পুড়িয়ে লোহা গরম করে পিঠের উপর চেপে ধরলে। এ রকম ভয়ঙ্কর শাস্তি সাদা চামড়ার মানুষরা অনেককে দিয়েছে।

সে অরণ্যের অন্ধকারে চোখ স্থির রেখে গাছ ধরে দাঁড়িয়ে রইল।

এই অরণ্য মায়ের কোলের মত। এখানে মহাজন আর বেনিয়া নেই। শনিয়ালালের মত শয়তানেরা আসে না। সাদা চামড়ার মানুষরা অনেক দূরে থাকে। তবে তোমাকে জঙ্গলের নিয়ম পদ্ধতিগুলো জানতে হবে। সেই নিয়ম পদ্ধতিগুলো মেনে চলতে হয়—তবে অরণ্য হবে মায়ের মত। নয়তো অরণ্য ডান হয়ে যায়। তোমার রক্ত মাংস সব গিলে খেয়ে নেবে।

এই অরণ্য এখন তার কাছে সব থেকে নিরাপদ আশ্রয়। সাদা চামড়ার মানুষেরা গন্ধ শুঁকে শুঁকে এত দূর আসতে পারবে না। তবে একটু হাড়িয়া পেলে ভালো হত। অনেকখানি হাড়িয়া খেয়ে নিলে মাথা পরিষ্কার হয়ে যায়। সে আরো ভালো করে সব কিছু ভাবতে পারতো।

সে আপন মনে ভেবে চলেছে। আর কি কি ঘটতে পারে ভবিষ্যতে। ফিরে গেলে একটা পোষা শুকরের মত মরতে হবে। বেঁধে নিয়ে গিয়ে একটা গাছের ডাল থেকে ঝুলিয়ে দিয়ে....

তুই কি এমুন কইরে মরবি; সে নিজেকে নিজে আবার প্রশ্ন করলো। চোখের সামনে বুড়ো বাপের শুকিয়ে যাওয়া শশার মত মুখখানা ভেসে উঠলো। চোখ দুটো বাইরে ঢেলে উঠেছে। মুখ খোলা। জিভ বাইরে বেরিয়ে আছে। মানুষটা গরমে ঘামতে ঘামতে সব রক্ত জল করে দিয়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে। অথচ সে জানতে পারে নি। অন্ধকারে দু'জনে এক সঙ্গে গুম ঘরে ছিল। অন্ধকারে একজন আর একজনকে দেখতে পায়নি। দুঃখে, ক্রোধে তারা এমন মরিয়া হয়ে ছিল যে বাপ ছেলে একটা কথা বলেনি।

গুম ঘরে তারা কতক্ষণ ছিল তা জানে না। সে এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম ভাঙ্গাতে প্রথম বুঝতে পারে নি কোথায় আছে। তারপর বুঝতে পারলো। বুঝতে পেরে বুড়ো বাপকে পেল। হাতে পা লেগে গেল। শক্ত পা। পা এত শক্ত কেন, মনে প্রশ্ন এল। তখন পেছনের দরজা খুলে গেল। এক ঝলক আলো এসে পড়লো।

অমনি সে অন্ধ হয়ে গেল।

বুড়ো মরেনি। বাইরে এনে মাটিতে শুইয়ে দিতেই বুক আবার কাঁপতে শুরু করেছে। আঃ—তবে মুক্তি—লোকটা অবাক চোড়ে তাকিয়েছিল। বাপের প্রাণ ফিরে আসছে, একটু একটু করে আসছে।

শনিয়ালালের লোকেরা জল দিল। বুড়ো বাপ জল খেল। জল পেয়ে প্রাণ দ্রুত ফিরে এল।

লোকগুলো বললো, কর্তার পা ধরে কাঁদবি সব ঠিক হয়ে যাবে। মানুষের দয়া মায়ার শরীর।

পা ধরার জন্য শনিয়ালালকে পাওয়া গেল না। মুক্তির হুকুম দিয়ে সে ঘোড়ার পিঠে চেপে সাদা চামড়ার মানুষদের কোঠীতে চলে গেছে।

বাপ, উঠতে পারবি? বুড়ো মানুষটা ছেলের হাত ধরে উঠে দাঁড়ালো। পা টলছে বলে তাকে জড়িয়ে ধরে খাড়া হয়ে দাঁড়ালো।

শনিয়ালালের দীকু সাকরেদ বললো, তোরা ঘরে যা।

দু'জনে হাঁটতে শুরু করলো। দু'জনে নয় একজনে। সে হাঁটছে আর তার কাঁধের উপর বুড়োর শরীর।

শনিয়ালালের বাড়ী থেকে রাস্তায়। দু'জনে উৎরাই পার হল। এবার চড়াইয়ের পথ। ওপরে উঠতে গিয়ে পিঠের উপর বুড়ো বাপ দু'বার কাশলো। অমনি তার পিঠ ভিজে গেল। বুড়ো বাপ যেন গরম জল পিঠের উপর ঢেলে দিয়েছে।

বুড়ো বাপকে পিঠ থেকে নামালো সে। পথের ওপর টান টান করে শুইয়ে দিল। বুড়ো বাপ আবার কাশলো। মুখ থেকে বেরিয়ে এল রক্ত। সে পিঠে হাত দিল পিঠে রক্ত।

বুড়ো বাপের চোখ তখন ঘোলাটে। থেকে থেকে কাশছে। কাশির সঙ্গে বেরিয়ে আসছে রক্ত। আবার কাশছে। যত কাশছে তত রক্ত। রাস্তা বুড়োর রক্তে লাল হয়ে গেল।

সে দু'হাত তুলে চোখ ঢাকলো বিড় বিড় করে বললো, না, না কাঁদবি কেনে? চুপ যা—তবু তার দু'চোখ ঝাপসা হয়ে গেল।

সে সোজা হয়ে দাঁড়াত। অমনি পিঠে টান পড়লো। পিঠ টন্ টন্ করে উঠলো, গ্রাহ্য করলো না। বনের আরো ভিতরে যাবার জন্য পা চালালো। এক নিরাপদ আশ্রয় চাই, যে আশ্রয় অবলম্বন করে একটা মানুষ বেঁচে থাকতে পারে। বাঁচার মত বাঁচা কিনা সে হল অন্য প্রশ্ন। এই অন্য প্রশ্নের জবাব সবার কাছে একরকম নয়।

লম্বা লম্বা পা ফেলে সে বনের মধ্য দিয়ে হেঁটে যেতে চাইছে। পা সামনের দিকে এগিয়ে দিতে কষ্ট হচ্ছে। মাথার মধ্যে যন্ত্রণা উঠে আসছে। এত দৌড়িয়েছে যে পায়ের গিট এখন টাটাচ্ছে। শরীর থাকলে শরীরে নানা রকমের ব্যথা বেদনা হতেই পারে। তাই বলে একটা মানুষের কাছে তাই চরম এবং শেষ কথা হতে পারে না।

সে নিজেকে নিজে এ সব কথা বোঝাল। ভিতরের মানুষ তার কথা বুঝতে পারলো। তাই তাকে দাঁড়াতে হল না। আপন মনে আবার নিজেকে নিজে জিজ্ঞাসা করলো, তুই বেঁচে থাইকবি না মইরবি? কুকুরের মত মইরবি যদি গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাক।

মরা বাঁচার প্রশ্ন তার মাথায় বার বার আসছে। স্বাধীনতা আর বেঁচে থাকার সার্থকতা। বেঁচে থাকার সার্থকতা অপেক্ষা স্বাধীনতা অনেক বড। অবশ্য দুটো ব্যাপারই মানুষের জীবনে সমান সত্য। বেঁচে থাকার জন্য লড়তে হয় আবার স্বাধীনতার জন্যেও লড়তে হয়। মানুষ নিজের সঙ্গে নিজে লড়াই করে বাঁচার দিকে এগিয়ে যায়। অবশ্য এখন তার কাছে সব কিছু অচল। এসব কথায় কোন মলা দাঁড়াচ্ছে না।

পা দুটো তার অচল হতে চাইছে। পা দুটোর অচল হবার পিছনে বাস্তব কারণ আছে। পা দুটো অনেক দৌড়িয়েছে। দেহের সব ওজন বহন করে দৌড়েছে। এখন হাঁটতে হবে। পা দেহের ওজন ধরে রাখতে চাইছে না। জোর করে ওজন চাপিয়ে দিতে হবে। তারা জোর করে গরুকে লাঙ্গল টানায় না? গরু আর লাঙ্গল টানবে কিনা কখনো জিজ্ঞাসা করা হয় না। গরুর পা চলছে কিনা, গ্যাটে ব্যাথায় টাটায় কিনা তা জানতে চায় নি।

গরু তাদের কাছে মায়ের মত। গরু তাদের ভাইয়ের মত। গরু তাদের বড় আপনজন। তবু গরুকে মাঠে নামতে হয়।

কেন?

আমার দরকার। আমার দরকার—এই হল সব কথার শেষ কথা। এখন পা টন্ টন করলেও হাঁটতে হবে। পা কি চায় তা ভেবে কোন লাভ নেই। পা দুটোকে এখন চলতেই হবে। এই রাস্তা থেকে অনেক দূরে নিজেকে নিয়ে যাওয়া দরকার।

যেখানে রাস্তা সেখানেই মহাজন আর সাদা চামড়ার মানুষ। রাস্তা মূর্তিমান সর্বনাশ। সমতলের দীকুরা প্রথম রাস্তা তৈরী করে। রাস্তা সমতল থেকে অজগরের মত আঁকা বাঁকা হয়ে ওপরে উঠে আসে। তারপর আসে সমতলের দীকুরা। তাদের মধ্যে থাকে অনেক শনিয়ালাল।

রাস্তা, সে বিকৃত গলায় বললো। থুথু ফেললো ঘৃণার সঙ্গে। দাঁড়িয়ে একটু দম নিল। কলজের জোর কমতে দেওয়া চলবে না।

একটা গাছ ধরে দাঁড়ালো। না, আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। মাথা বুকের উপর নেমে আসতে চাইছে। এবার পা দুটোকে একটু বিশ্রাম দিতে হবে। পা দুটো তার নিজের। সে হাঁটু ভেঙ্গে বসে গেল একটা গাছের নিচে।

হঠাৎ বন জেগে উঠলো। বাদর কিচির মিচির করে গাছের ডাল ধরে ঝাঁকাচ্ছে। অমনি সে সচেতন হল। সামান্য সময়ের জন্য অপেক্ষা করলো। সামনের সব থেকে উঁচু গাছের কাছে চলে গেল। এবার গাছের ওপর ওঠার পালা। গাছ বেয়ে ওঠা তার কাছে কোন কঠিন কাজ নয়। সে গাছের অনেকটা ওপরে উঠে গাছের একটা ডালে বসলো। বাঁদরগুলো তাকে গাছে চাপতে দেখে আরো উত্তেজিত। আরো কয়েকটা বাঁদর এল পাশের গাছে। পাতার ফাঁক থেকে ঘাড়

নিচু করে কি যেন দেখলো। আবার কিচির মিচির শব্দ এবং গাছের ডালে ঝাকুনি দিল। পাখীগুলো বানরদের সঙ্গে গলা মেলালো। একটা ময়ূর কঁ-ক ক করে শব্দ তুলে ত্রস্তভাবে উড়ে গেল। তার শিরদাঁড়া বেয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত নেমে আসছে। সে আপন মনে ভাবলো, ভয় পেলেই ভয় পেতে হয়। কিন্তু অনেক সময় আসে যখন ভয় হয়ে ওঠে জীবন রক্ষার উপায়।

গাছের ডাল ধরে সে আর একটু ওপরে উঠলা। এবার দেখতে পেল মারী। সারা গায়ে ফুটকী দাগ নিয়ে একটা হরিণ শুয়ে আছে। মাথার শিং মাটির উপর। অন্য শিং খাড়া হয়ে উপর দিকে উঠে এসেছে। হরিণ ঘুমোচ্ছে। তার লেজ থেকে বুক পর্যন্ত মাংস নেই. সবটাই খেয়ে নিয়েছে।

বাঘের মারী। সঙ্গে সঙ্গে আরণ্যক সতর্কতা সজীব হল। এক খাবলা বাতাস বুকের ভেতর টেনে নিল। অস্ফুট গলায় বললো, বাঘ।

বাঁদরগুলো আবার কিচির মিচির করে উঠলো। বাঘ মারীর কাছে আসছে। হরিণের বাকী অংশ এবার খাবে। সে নিজের মধ্যে স্বস্তি অনুভব করলো। বাঘের খাদ্য মজুত আছে। এখন সে আর ভয়ঙ্কর নয়। পারতপক্ষে কোন জানোযার মানুষকে আক্রমণ করে না খাদ্য থাকলে কোন পশু শিকার করে না। মানুষ করে। শষ্য গোলায় মজুত থাকলেও আরো শষ্য নিয়ে আসে। পরের জমির ফসল কেটে তুলে নিয়ে যায়। প্রয়োজনে দাঙ্গা করে। সমতলের দীকু আর সাদা চামড়ার মানুষেরা সব সময়ের জন্য শিকারী।

শনিয়ালালের মত মানুষরা বাঘ নয় বাঘের চেয়েও ভয়ঙ্কর। তাদের খিদে আগুনের মত। এক অরণ্য গ্রাস ক'রে আর এক অরণ্যের দিকে ধেয়ে যায়। যদি হাওয়া পায় তবে ফাঁকা সমতলের জমি সে আগুন আটকে রাখতে পারে না। ঘাষ, জঙ্গল দগ্ধ ক'রে ওপাড়ের অরণ্যে গিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। সাদা চামড়ার মানুষেরা তাদের সেপাই আর শান্ত্রীরা হল সেই হাওয়া।

হারামখোর, শয়তানের বাচ্চা, বিকৃত গলায় সে স্বগতোক্তি করলো। সতর্ক হল। কাছেই বাঘ বসে আছে মারী আগলে। ক্ষুধার্ত না হলেও সে বাঘ। তার মনে পড়ে গেল সেই ডান মাগীর কথা।

তাদের গাঁয়ে সে ছিল। তখন তার জন্ম হয়নি। মেয়ে মানুষটা একা জঙ্গলের পাশে ছিল। সে পেট ফুলিয়ে ঢাক বানাল। পঞ্চজন তাকে ডেকে আনলো। বললো, তোর পেটের বাচ্চার বাপটা কে? বাপের নামটি বুল। মুরগী দিয়ে মরদটা বিয়ে করুক।

মেয়েটা জবাব দিল না। মুখ নিচু করে বসে রইল।

পঞ্চপ্রধান আবার জিজ্ঞাসা করলো, বাপের নামটো তু বুল।

মেয়েটি জবাব দিল না।

পঞ্চপ্রধান তিন তিনবার জিজ্ঞাসা করলো।

মেয়েটি কোন জবাব দিল না।

তখন পঞ্চপ্রধান বললো, তুই কি শয়তানটোর সঙ্গে শুয়ঁ্যা ছিলি?

সবাই বললো, হে, হে, তাই হবে। লয়তো গায়ের কুন মরদ বাপ হবার কথা। তা হয় ন। কেনে?

গাঁ থেকে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হল। সে দৌড়ে পালিয়ে গেল। গাঁয়ের শেষে পাহাড়। পাহাড়ের একটা গুহায় আশ্রয় নিল। তখন শয়তান তার কাছে এল। পেটের বাচ্চাটাকে খেয়ে নিল। মেয়েটাকে শিখিয়ে দিল বাঘ হবার মন্ত্র। মাগীটা যখন তখন মন্ত্র পড়ে বাঘ হত। মোষের দল থেকে মোষ তুলে নিয়ে চলে যেত। গরুর পাল থেকে গরু। বনের পথে একা কোন মরদকে দেখতে পেলে আবার মেয়ে মানুষ হত। মরদটিকে ভুলিয়ে গুহার মধ্যে নিয়ে যেত। তারপর পুরুষের জানুসন্ধী থেকে ঝুলে থাকা কালো পাখীর লাল ঠোঁট নিয়ে খেলতো। অনেক সময় ধরে এই খেলা খেলতো। বীজ ফেলতে দিত না। যদি বীজ ফেলতো তবে মরদের কলেজে ফেটে দু'ফাক হয়ে যেত। ডাইনীমাগী সেই কলজের মাংস খেয়ে নিত।

গাঁয়ের মানুষ শেষ পর্যন্ত গুহায় আগুন লাগিয়ে তাকে পুড়িয়ে

মেরে ফেলে।

এবার সে বাঘটাকে দেখতে পেল। মারীর কাছে এসে বসেছে। জিভ বের করে নাকের মাথা চাটছে। হাত পাঁচেকের মত লম্বা বাঘ। চামড়া রোদে কি উজ্জ্বল।

বন আবার ভয়ে স্তব্ধ হল। পাখীগুলোও আর ডাকছে না। বাঁদরগুলো চুপচাপ। ভয় পেয়েছে।

লোকটি নাক টেনে গন্ধ নিল। গাছের পাতা দেখলো। বুঝে নিল কোন দিক থেকে হাওয়া আসছে। এবার সে সতর্কতার সঙ্গে গাছ থেকে নিচে নেমে এল। হাওয়ার উল্টো দিকে হাঁটা শুরু করলো। বাঘের মারীর পাশে আর থাকা নয়।

হাওয়ার দিকে যাচ্ছে বলে নাকে পচা গন্ধ এল। সে দাঁড়ালো না। পচাগন্ধ একসময় শেষ হল। দেখতে পেল নালাটাকে। গাছের নিচ দিয়ে নালা চলে গেছে বাঁয়ে ঘুরে নিচের দিকে। নালা গভীর। নিচে নেমে পড়লে নিজেকে নিরাপদ মনে করতে পারবে। উঁচু থেকে অত নিচুতে কোন জানোয়ার ঝাঁপ দেবে না। জানোয়ারের মৃত্যুভয় আছে। শিকারের জন্য নিজের জীবন পণ রাখে না।

সে নালার মধ্যে নেমে গেল। খানিকটা পথ গিয়ে থমকে দাঁড়ালো। নিজেকে নিজে জিজ্ঞাসা করলো, নালা পথ বেয়ে যদি একটা জানোয়ার ওপর দিকে উঠতে থাকে? সে নামছে নিচে জানোয়ারটা উঠছে ওপরে। দু'জনে মুখোমুখী। কি আশ্চর্য সে বনের নিয়ম কানুনগুলি ভুলে যাচ্ছে!

নালা বেয়ে সে উপরে উঠে এল। থামলো না। সে হেঁটে চলছে। পায়ে যন্ত্রণা। মনে মনে পা দুটিকে গালাগালি করছে। আবার অবাধ্য পা দুটিকে টেনে নিয়ে এগিয়ে চলছে। একটা নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত তাকে হাঁটতেই হবে।

একটা পাথরের টিপির সামনে এসে দাঁড়ালো। কাছে গিয়ে যাচাই করে নিল। কালো পাথরের বিশাল চাঁই। ডান পাশের পাথর ফেটে

হাঁ হয়ে আছে। ফাটল খানিকটা গভীর। ফাটলের মধ্যে ঢুকলে খানিকটা নিরাপদ আশ্রয়।

আশ্রয় ?

মানুষের আশ্রয় হবে মানুষের মত। তারা তাদের ঘর তৈরী করে নিজেদের হাতে। মাটির দেওয়াল গেঁথে ওপরে দেওয়া হয় ছাউনি। মেয়েরা গোবরমাটির প্রলেপ দিয়ে ঝকঝকে করে তোলে। এমনি একখানা ঘর হতে পারে মানুষের আশ্রয়। হতে পারে ঘর ছোট অথবা বড়—সে যেমন হোক, তার সঙ্গে আছে সংসার পাতার স্বপ্ন।

ফাটা পাথরের আশ্রয়ে কোন স্বপ্ন নেই, সম্ভাবনা নেই—

পাথরের পাশেই একটা ঝোপ। ঝোপের মধ্য থেকে একটা পাখী উড়ে গেল। ঝোপের নিচু ডালে পাখীর বাসা দেখতে পেল। চারটে সাদা ডিম বাসার মধ্যে পড়ে আছে।

পেটের মধ্যে ক্ষুধা মোচড় মেরে উঠলো। দু'দিন দু'রাত পার হয়ে গেছে সে খাবার মত কোন খাদ্য খায়নি। খাবার কথা মনেও আসেনি। প্রথম সে উত্তেজনার আবর্তে পড়ে দিগ্বিদিক্ হারিয়ে দৌড়িয়েছে। তারপর হেঁটেছে। কত পথ হেঁটেছে তার হিসাব রাখেনি। খাবার কথা, মনে আসে নি।

পথে একবার সে একটা ফাঁকা জায়গা পেয়েছিল। অজস্র ধাতি ফুল ফুটে ছিল। লাল সিঁদুরের টিপের মত অনেক ফুল দেখে একবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। হরিণ ধাতি ফুল পেলে খতনার জানোয়ারের কথা ভুলে খেতে থাকে। সে কয়েকটা ফুল তুলে খেয়েছিল। কিন্তু দাঁড়ায়নি। হরিণের বন সব থেকে নিরাপদ অথচ বিপজ্জনক। হরিণ নিজের বাঁচার তাগিদে জানোয়ারদের যাতায়াতের পথ এড়িয়ে চলে। অথচ তার পিছনেই ঘুরে বেড়ায় সব থেকে হিংস্র জানোয়ার।

ডিম ক'টি তার ক্ষুধা জাগিয়ে দিল। এবার সে বুঝতে পারলো ক্ষুধায় সে কত কাতর। পেটের মধ্যে চুপচাপ ঘুমিয়ে থাকা ক্ষুধা আগুনের শিখা হয়ে যেন লাফিয়ে উঠল।

ডিম ক'টি হাতে তুলে নিল। ডিমগুলি গরম। একটা টোকা মারতেই একটা ডিম ফেটে গেল। মুখের মধ্যে ডিম ঢেলে দিয়ে গিলে খেল। পরপর চারটে ডিম উদরস্থ হল।

হাতের চেটো দিয়ে মুখ পুছে নিয়ে পাথরের ফাটলের মধ্যে শরীব ঢুকিয়ে দিল। এখন নিজেকে ভয়ানক ক্লান্ত মনে হচ্ছে। পাহাড় প্রমান ক্লান্তি আর অবসাদ কাঁধের ওপর চেপে বসলো। এতক্ষণে বসার মত একটা জায়গা পেল। নিরাপদ স্থান তা নয়, তবু বসার মত জায়গা। এখন তার তিন পাশে পাথরের আড়াল। এখানে বসে ভাবতে পারবে। ভাবনা যদি মাথায় না আসে তবে বিশ্রাম। সে বসে পড়লো।

ঠেস দিয়ে বসতেই চোখ আপনি বন্ধ হয়ে গেল।

ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখলো। একটা লাল গরু পাহাড়ের অনেক ওপরে দাঁড়িয়ে আছে। লাল গরু নিচে নামতে চাইছে কিন্তু নামতে পারছে না। কালো মেঘ এসে লাল গরুটাকে ঢেকে দিল। তারপর গভীর ঘুমে সে তলিয়ে গেল।

ঘুম যখন ভাঙলো তখন সূর্য উঠে এসেছে আকাশে। চোখ খুলে দেখতে পেল পাতার ফাঁক থেকে নেমে আসা আলো। এখানকার বন নিবিড় নয়। সামনে ছোট একটা খোলা মেলা প্রান্তর। সবুজ ঘাস মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। ঘাসের ওপর রোদ হলুদ আভায় জ্বলছে।

সে চোখ বুলিয়ে একবার চারদিক দেখে নিল। এখন সে গভীর বনের মধ্যে। বনের মধ্যে কোথায় এবং কোন্ বনের মধ্যে তাতো জানে না। সূর্যের দিকে তাকালো। বুঝতে পারলো দক্ষিণের দেশে চলে এসেছে। তবে এ কোন দেশ তা জানা নেই।

অবশ্য এই দেশ, দিক এসব নিয়ে তার কোন মাথা ব্যথা নেই। তাদের ছোট গ্রাম আর তার চারপাশের বন নিয়ে তার দেশ। এতদিন ধরে তার জানা দেশ বদলে গেল। এখন এই বন আর তার নিবিড় অন্ধকারকে ভালোবাসলেই নিজের হয়ে উঠবে। আসলে কোন বন বা

গ্রাম আমাদের নিজেদের নয়-সে আপন মনে ভাবলো। সব দেশ আর বন শিংবোঙা ঠাকুরের। আমরা শুধু ভাবি আমাদের। ভালোবাসলে নিজের হয়ে ওঠে। বন, বনের গাছ, মাঠ, গরু এবং চষার ক্ষেত নিজের ভাই বোন এবং মায়ের মত হয়ে যায়।

এসব ভাবনা বেশি সময় তার মাথায় থাকলো না। বনের মধ্যে নিরস্ত্র মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না। বনের নিয়ম বন মেনে চলবে। তোমাকে বনের নিয়ম মেনে বেঁচে থাকতে হবে। এবার তার বেঁচে থাকার কথা মনে এল। সে পা দুটিকে গুটিয়ে নিল। পা দু'খানা বিশ্রাম পেয়ে আবার শক্তি ফিরে পেয়েছে। তার কথা শুনছে। সে উঠে দাঁড়ালো। হ্যাঁ, এখন সে আগের মত হাঁটতে পারবে।

এবার পাথরের ফোঁকর থেকে বাইরে বেরিয়ে এল। আবার দেখতে পেল সেই পাখীর বাসাটিকে। দুটো পাখী পাশাপাশি বাসার মধ্যে ডানা গুটিয়ে বসে আছে।

পাথরের ফোঁকর থেকে সে বাইরে বেরিয়ে আসতেই পাখী দুটো ভয়ার্ত শব্দ করে উড়ে গেল। পাখীর একটিকেও ধরবার সুযোগ হল না। তবু পাখীর বাসার কাছে গেল। এবার পেটের ক্ষুধা তাকে জানান দিচ্ছে। এখন কিছু খাওয়া তার একান্ত দরকার, নয়তো কলজের জোর কমে যাবে। পাখীর বাসা শূণ্য। গতকাল চার চারটে ডিম সে খেয়ে নিয়েছে।

আবার তাকে হাঁটতে হবে। খাবার মত কিছু খাবার খুঁজে পেতে হবে। একটানা ঘুমে শরীরের ক্লান্তি অনেকটাই চলে গেছে। পা শক্ত করে ফেলতে পারছে।

খানিকটা হাঁটার পর একটা ফলের গাছ দেখতে পেল। ফলগুলো পেকে লাল হয়ে আছে। কতগুলো পাকা ফল মাটিতে ঝরে পড়ে আছে। একটা ফল তুলে মুখে ফেললো। একটু নোনতা স্বাদ। তা হোক তবু খাদ্য।

পা ছড়িয়ে বসে পড়লো। একটা একটা করে ফল মুখের মধ্যে

ফেলছে। তাড়াহুড়ো করবার কিছু নেই। বনের মধ্যে সে একা। তার খাদ্যের কোন ভাগিদার নেই। এসব জেনেও প্রথম কয়েকটা ফল আস্ত গিলে খেল। কয়েকটা ফল পেটের মধ্যে চালান করে দেওয়াতে ক্ষুধার তাড়না কমে গেল। এবার সে একটার পর একটা ফল চিবিয়ে চিবিয়ে খেতে শুরু করলো। ফলের রস ঠোঁটের ফাঁক বেয়ে নিচের দিকে নামছে। বুকের ওপর ঝরে পড়ছে। হাতের চাটু দিয়ে মুছে নিচ্ছে, আবার পড়ছে।

পর পর অনেকগুলো ফল খেয়ে নিল। এবার মুখ বিস্বাদ লাগছে। আসলে একা একা খাওয়া এটা কোন খাওয়া নয়, সে ভাবলো। এরকম খাওয়ার মধ্যে খাবার যে আনন্দ তা নেই। খাবার যাই হোক না কেন তার সঙ্গে আনন্দ থাকা চাই। ঐ আনন্দটুকু হল খাবারের স্বাদ।

তার মনে পড়লো বনের মধ্যে হারিয়ে যাওয়ার কথা। দলে ছিল তারা দশজন। এরোছিম পর্বে বনের মধ্যে শিকার করতে গিয়েছিল। তারা কোন শিকার পাচ্ছিল না। শূন্য হাতে ফিরে এলে গাঁয়ের মেয়েগুলো হাসবে। তাই তারা পাহাড় থেকে আর এক পাহাড়ে চলে যাচ্ছিল। তারপর আর পথ খুঁজে পাচ্ছিল না।

শেষ পর্যন্ত তারা একটা পাটকিলে রঙের শেয়াল শিকার করতে পেরেছিল। শেয়ালের শরীরে তেমন কোন মাংস ছিল না। শেয়ালটা ছিল বুড়ো। শুকনো পাতায় আগুন জ্বেলে নিয়ে বুড়ো শেয়ালটাকে ঝলসে নিয়েছিল। আঁশ আঁশ মাংসগুলো দশজনে গোল হয়ে বসে খেয়েছিল। তাদের মাঝখানে ছিল পোড়া পাতার ছাই। আকাশে ছিল বিশাল চাঁদ। চাঁদের আলো ছিল বনের মধ্যে। বুধাই তখন শুরু করেছিল তার রাসকাকানার গল্প।

বুধাই বলছিল পাহাড়ের কথা। পাহাড়ের পাশে গাঁয়ের একটা মেয়ের মন ভুলিয়েছিল। তার উদ্ধত বুক টিপে দিয়েছিল। বড় বড় দুটি উদ্ধত স্তন তার ভয়ানক ভালো লেগেছিল। বুধাইর আরো কিছু করার ইচ্ছা ছিল।

হোপন কুড়ি সে সুযোগ তাকে আর দেয় নি। হেসে বলেছিল, তুয় লাল ঠোঁটের কালো পাখী ঝটপটায়? তু তোর বাপটোকে বুল। বিয়া কইরে লে, তারপর তুর খুশিমত···

পাহাড় থেকে ফিরে বুধাই বাপকে বলার কথা ভেবেছিল। নিজের রাসকাকানার কথা কি ভাবে নিজের মুখে বলবে বুঝতে পারে নি। মা থাকলে বলা সহজ হত। মাকে বললে মা বাপকে বলে দিত। বাপ কাঁধে গামছা ফেলে পাহাড়ের পথে পা বাড়াতো।

বুধাইর জীবনে ঘটনা ঘটেছিলো অন্যরকম। কয়েক দিনের মাথায় একা একা গেল বনের মধ্যে। বনের মধ্যে আর এক যুবতীকে দেখে নেশা লেগে গেল। নেশায় পাগল হয়ে বারবার তার কাছে চলে যেত। সুযোগ পেয়ে মেয়ে মানুষটা বুধাইর কলজে উপড়ে খেয়ে নিল। নিজের কলজেটা উপড়ে দিয়ে বুধাই মরে যায়।

মেয়ে মানুষটা ছিল বনের ডান।

বনের মধ্যে এরকম ঘটে। লোভের ফাঁদ তোমার ঘরে, তোমার মাঠে, পাহাড়ে, জঙ্গলে—সর্বত্র পাতা আছে। তুমি সাবধানে চল হে।

সেই বুনো শেয়ালের মাংস খাওয়া—ভুলবার নয়। মাংসে ছিল অনেক আঁশ। একটা গন্ধও ছিল। তাতে তাদের কোন অসুবিধা হয় নি। বুড়ো শেয়ালের মাংস খেতে তারা এক অদ্ভুত আনন্দ পেয়েছিল। অমন আনন্দ, না, একা একা খাবার মধ্যে কোন সুখ নেই।

সে আপন মনে মাথা ঝাঁকালো।

ফলের রসে পেট ভরে গেল না। কিন্তু আর খাওয়া যাচ্ছে না বিস্বাদ ফলগুলি। গলার ভিতর খস্ খস্ করছে।

সে উঠে দাঁড়ালো। কেন আবার দাঁড়ালো নিজেই জানে না। আবার হাঁটা শুরু করেছে। হাঁটতে হাঁটতে এবার সে ভাবছে কোথাও যাবার কথা। মানুষের একটা নির্দৃষ্ট লক্ষ্য থাকে। সেই লক্ষ্যে সে হাঁটতে থাকে। কোথায় যাবে সেই অনিবার্য প্রশ্ন এবার মনে এল।

যাবার মত তার আর কোন জায়গা নেই। সে একেবারে একা—আকাশের তারার মত একা। এক একটা তারার পাশে থাকে অনেক শূণ্যতার অন্ধকার। তার চারপাশে শূণ্যতা নেই আছে একের পর এক গাছ। গাছগুলো এখন তারার পাশে শূণ্যতার অন্ধকারের মত। তবু তাকে হাঁটতে হবে। মানুষের সমাজে আর ফিরে যাওয়া যাবে না। যাবার ইচ্ছাও আর নেই। মানুষের সমাজে ফিরে গেলে আবার সেই সাদা চামড়ার মানুষ। সাদা চামড়ার মানুষের পাশে দীকু। খাজনা দে, সুদ দে, টাকা দে—না, সে আর ভাবতে পারছে না।

কোথাও যাবার নেই তবু হাঁটতে হবে। মানুষকে জন্ম থেকে হাঁটতে হয় অথবা করতে হয় কোন কাজ। কাজ না থাকলে হাঁটতে হয়। কি অদ্ভুত চান্দোবোঙ্গার এই নিয়ম। তুমি এক জায়গায় বসে থাকতে পারবে না। তোমার ভিতরের মানুষ তোমাকে বসে থাকতে দেবে না। তুমি কাজ কর—নিজের জন্য অথবা সমাজের জন্য। যদি কাজ না কর তোমাকে হাঁটতে হব। তোমার আশ্রয় তোমাকে নিজেই গড়ে নিতে হবে। তোমার খাবার তোমাকে খুঁজে পেতে হবে অথবা সৃজন করতে হবে। তাই তুমি কাজ কর। কাজ না পাওয়া পর্যন্ত তোমাকে হাঁটতে হবে—শুধু হাঁটবে।

তাদের সমাজ আর আগের মত নেই। পিতৃপুরুষের শিক্ষা ভুলে গিয়ে কালো মানুষগুলো সবাই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। সবাই নিজের কথা ভাবছে। দীকু আর সাদা চামড়ার মানুষেরা ভাইয়ে ভাইয়ে যে ভালোবাসা সে ভালোবাসা মেরে ফেলেছে। এক সময় বস্তীর সবাই আর সবাইকে ভালোবাসতো। একজনের বিপদ সকলের বিপদ বলে ভাবতো।

এখন এসব ভাবনা আর নেই। পাহাড় থেকে অতীতের আইন কানুন সব এক এক করে হারিয়ে গেছে। এখন সবাই নিজেকে নিয়ে বাঁচতে চাইছে। পাশের ঘর থেকে যখন দীকুরা গরু, মোষ টেনে নিয়ে যায় তখন বাধা দেয় না। টিপ ছাপ দেখিয়ে খেতের ফসল তুলে নিয়ে যায় তখন সবাই হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। সাদা চামড়ার মানুস আর

দীকুরা তাদের সমাজকে একটা মাটির ঢেলার মত গুড়ো গুড়ো করে দিয়েছে।

তাকে বাঁচতে হবে, সে ভাবলো। এখন থাকার মত একটা আশ্রয় খুঁজে নিতে হবে—এই হল শেষ কথা। ইঁদুর, শেয়াল, কুকুরেরও একটা আশ্রয় থাকে। নিরাপদ আশ্রয়ের সঙ্গে চাই একখানা অস্ত্র। আত্মরক্ষার উপায়। শুধু হাতে কখনই সে নিরাপদ নয়, যে কোন মুহূর্তে বিপদ ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

তখন তার টাঙ্গীর কথা মনে এল। অনেক দিনের সঙ্গী ঐ টাঙ্গী-খানা। তার আগে তার বাবা ব্যবহার করেছে যখন সে মরদ ছিল। বাবার আগে তার দাদুর হাতে ছিল। তিন পুরুষ ধরে একখানা টাঙ্গী এক হাত থেকে আর এক হাতে এসেছে।

টাঙ্গীখানা নিয়ে দাদু দু'দুটো ভাল্লুকের সঙ্গে লড়াই করেছিল। দুটো ভাল্লুককে টাঙ্গী দিয়ে কুপিয়ে মেরে তবে গ্রামে ফিরে এসেছিল। গায়ে ছিল কয়েকটা নখের দাগ আর পিঠের উপর ভাল্লুকের দুটো চামড়া! টাঙ্গীখানা ছিল তাদের বংশের গৌরব। শনিয়ালালের খতনার অনুচরের কাঁধে বিঁধে থেকে টাঙ্গীখানা হারিয়ে গেল।

চোখের ওপর ভেসে উঠলো সেই দৃশ্য। একটা মানুষ ঘোড়ার পিঠে চেপে পালিয়ে যাচ্ছে। তার কাঁধের উপর বিঁধে আছে একখানা টাঙ্গী।

এখন সে বাস্তব পরিস্থিতি অনুভব করতে পারছে। নিজেকে অসহায় দুর্বল মনে হল। ভিতরের মানুষটা ঘুমিয়ে পড়েছে। অবশ্য ভিতরের মানুষটা ঘুমিয়েই থাকে। কখনো কখনো জেগে ওঠে। এক এক সময় এক এক চেহারায় আত্মপ্রকাশ করে।

সে বুক ভর্তি করে বাতাস টেনে নিল। তবু কলজেতে তেমন কোন জোর পাচ্ছে না। একটা অবলম্বন তার চাই, হ্যাঁ, একটা অবলম্বন। সে আপন মনে মাথা ঝাঁকালো।

গাছের একটা ভাঙ্গা ডাল দেখতে পেল। যাবার পথে হাতী ভেঙ্গে ফেলে রেখে গেছে। হাতীর পুরীষ দেখতে পেল। তাই বলে সে

ভয় পেল না। ডালখানা দু'হাতে চেপে ধরলো। তার হাতের শিরা ফুলে উঠলো। চিবুক শক্ত হল। শরীরের সব শক্তি সংহত করে ডাল-খানা আঁকড়ে ধরলো।

ডালের গায়ে অনেক লম্বা সরু সরু ডাল। পাতাগুলো হাতী খেয়ে নিয়েছে। সে ডালখানা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে নিল। সামান্য শ্রমে ডালখানাকে লাঠিতে পরিণত করা যাবে। তার আত্মবিশ্বাস এবার ফিরে এল। বুকে জোর পেল। বাড়তি ডালপালা ভাঙ্গতে শুরু করলো। সবগুলো ভাঙ্গা গেল না। একখানা পাথর সংগ্রহ করে নিল। পাথরের উপর ডাল রেখে ঘা মারলো। ঘা মেরে থেতলে দিল। ক্রমশঃ ডালের অপ্রয়োজনীয় অংশ বাদ হয়ে গেল। ডালপালাহীন একখানা লগুড় হাতে এল। দেখতে হল মোটা এবং ভারি।

হাতে তৈরী লগুড়টিকে নেড়ে চেড়ে দেখলো পছন্দ হল না। ব্যবহারে কিছু অসুবিধা আছে। এবার সে লগুড় পাথরের উপর ঘষাঘষি করলো। আবার মনে এল গ্রামের কথা। তীর ধনুক তারা নিজের হাতে তৈরী করে নিত। অবশ্য তীরের ফলা কামার তৈরী করে দিত। তার পরের কাজগুলো সব নিজের হাতেই করতে হত। কত যত্ন আর শ্রম তারা প্রয়োগ করতো। এক রকমের ভালোবাসা এসে যেত। তখন অস্ত্র আর শুধু অস্ত্র নয়, ভালোবাসার সম্পদ। লগুড় তৈরী করতে সেই যত্ন আর ভালোবাসা সে দিতে পারছে না। ডাল কাটার মত একটা অস্ত্র থাকলে সম্ভব হত।

সাদা চামড়ার মানুষেরা হাতের অস্ত্রকে নিজের ভাই বোনের মত ভাবে? প্রশ্ন তার মনে এল। জবাব তার জানা নেই।

ঘষাঘষি করাতে ডালের গাটগুলি খানিকটা মসৃণ হল। সে এবার আপন মনে মাথা নাড়লো। লগুড়ের গায় হাত বোলালো। হ্যাঁ, লগুড় এবার ব্যবহার করার মত হয়েছে। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে লগুড় হাতে নিয়ে অরণ্যের মধ্যে শালগাছের মত খাড়া হয়ে দাঁড়ালো।

এবার তার বুড়ো বাপের কথা মনে এল। অন্ধকারের শয়তান বুড়ো মানুষটার বুকের রক্ত সব শুষে খেয়ে নিল। লোকগুলো বুড়ো বাপকে ধরে এনে বাইরে বসিয়ে দিল। মুখখানা তখন শুকনো শশার মত নিস্তেজ। চোখ দুটো কোঠরের ভিতর ঢুকে গেছে।

বুড়ো বাইরের আলো বাতাসের মুখোমুখি হয়ে খাবি খেল। সে সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল। বুড়ো বাপ তাকে প্রথম চিনতেই পারেনি। তার ভাবনা আর এগোবার সুযোগ পেল না। আবার দেখতে পেল হাতীর পুরীষ। গরম। সামান্য আগে এই পথ ধরে নিচের দিকে হাতীর পাল নেমে গেছে। এখন সে একটা সংকীর্ণ স্থানের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। ডান পাশে পাহাড়ের দেওয়াল, বাঁ পাশে বিশাল খাদ। পথের উপর হাতীর পুরীষ। সে আর নিচের দিকে নামলো না। আবার ফেলে আসা পথ ধরলো।

খানিকটা ওপরে উঠে ডানদিকে ঘুরে গেল। এখানে গাছপালা অনেকটা ফাঁকা। মাঝখানে একখানা পাথর। সে পাথরখানার ওপর বসলো।

পাথরের ওপর বসে সে ভাবতে লাগলো যা যা তার মনে আসে।

এই রোদের মধ্যে একা বসে থাকা তার বড় ভাল লাগছে। তার চারপাশে ফুল ফুটে আছে। ফুলগুলো তারা ভেজে খায়। এখন এখানে ফুলগুলো পেয়েও সে ভেজে খেতে পারবে না। তবুও সে বসে আছে লগুড় নিয়ে। কিন্তু একা।

একা বেশি সময় থাকা যায় না। মানুষকে কথা বলতে হয়। কয়েকটা দিন চলে গেল সে কথা বলেনি। এখন ইচ্ছে করলে কথা বলতে পারে। সে কথা বলবে। এখন তার সামনে তার নিজের ছায়া। ভিতরের মানুষটা আবার বাইরে বেড়িয়ে এসেছে। তার পাশে আর একটা পাথরের ওপর বসে আছে। এখন সে তার ছায়ার সঙ্গে বসে কথা বলতে পারে।

সে কথা বলতে শুরু করলো। ছায়ার পানে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা

করলো, আচ্ছা, তুই কি বলতে পারবি একটা মানুষের কি কি চাই ?

ছায়ার পানে তাকিয়ে বসে রইল। ছায়া কোন উত্তর দিল না? সে লগুড় দিয়ে নিজের ছায়াকে আঘাত করলো। হাতের ছায়া নড়ে উঠলো। ছায়া কোন জবাব দিল না।

তার মাথার উপর এখন সূর্য তামার মত জ্বলছে। আকাশ রোদের ছটায় উজ্বল। মানুষটি আকাশ দেখছে না। তার ডান বাঁয়ে সব দিকে একের পর এক গাছ। রোদের মধ্যে সবাই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝখানে এই সামান্য জায়গাটুকু শুধু ফাঁকা। সেই ফাঁকায় উজ্জ্বল রোদ আর নীল ফুল

তার পাশ থেকে একটা সাপ চলে গেল। খস্‌খস্ আওয়াজ শুনে ফিরে তাকালো। দেখতে পেল সাপটাকে। লম্বা শরীর নিয়ে সরল রেখায় শুকনো পাতার উপর দিয়ে চলে গেল। তার চলা মন্থর গতিতে। পেট ফোলা। হয়তো একটা ইঁদুর শিকার করেছে। পরিতৃপ্তি নিয়ে চলে গেল নিজের আশ্রয়ে। একটা মানুষ যে বসে আছে তা লক্ষ্য করে নি।

মানুষ আছে টের পেলে সে থমকে দাঁড়াতো। পথ পাল্টে অন্য দিকে চলে যেত। জীবজগত মানুষকে ভয় পায়। মানুষ নামে জীবটিকে এড়িয়ে চলে। সহজাত বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারে মানুষ সহজ নয়, বিপজ্জনক।

মানুষ মানুষকে এড়িয়ে চলতে পারে না। অনেক মানুষ নিয়ে এক একটা গ্রাম। তারা সবাই সুখ ও দুঃখের অংশীদার। সেই নিয়মের মধ্যে শনিয়ালালের মত মানুষেরা ব্যতিক্রম। তারা জঙ্গলের জানোয়ার শিকার করে আর শনিয়ালালের দল শিকার করে মানুষ।

সে মানুষ হয়ে মানুষ শিকার করে সাদা চামড়ার মানুষদের মত। কোন নিয়ম পদ্ধতি মানে না। শিকার করার কতগুলো নিয়ম আছে, অথচ মানুষ শিকারীরা কোন নিয়ম মানে না। অথচ শনিয়ালাল আর দীকু বেনিয়ারা সব সময় কানুনের কথা বলে। এমন সব কানুনের কথা

বলে যার অর্থ তারা বুঝতেই পারে না। সে সব কানুন দীকুরা নিজেরা মানে না অথচ তাদের মানতে বাধ্য করে।

সাদা চামড়ার মানুষগুলি আরো অদ্ভুত। তাদের মত বস্তী তৈরী করে বাস করে না। এক একটা বাড়ী থেকে আর একটা বাড়ী থাকে অনেক দূরে। দল বেঁধে না থেকে দূরে দূরে থাকে।

বিশাল এক একটা বাড়ী তৈরী করে তার ভিতর সাদা চামড়ার মানুষেরা থাকে। বাড়ীর মধ্যে থাকে একের পর আর একটা ঘর, তার পাশে আর একটা ঘর। ঘরের মধ্যে থাকে আবার ঘর। সঙ্গে একটা মেয়েমানুষ থাকে। সাদা চামড়ার মানুষদের বাপ মা নেই। যদি থাকে তবে কোথায় থাকে? ছেলের সঙ্গে থাকে না? সাদা চামড়ার মানুষদের বাপ মা দুটো যদি না থাকে তবে মানুষগুলো আসে কোথা থেকে?

জটিল ভাবনাগুলো এখন তার মাথার মধ্যে পাক খাচ্ছে—সাদা মানুষেরা আসে কি করে? যে দেশের মানুষদের বাপ মা থাকে না সে দেশ অদ্ভুত। হয়তো সাদা চামড়ার মানুষদের দেশে এরকম জঙ্গল নেই। জঙ্গল নেই বলে কোন জানোয়ার নেই। জানোয়ার নেই বলে জানোয়ার শিকার করতে শেখে না। সাদা চামড়ার মানুষরা সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এসেছে কালো মানুষের দেশে, কালো চামড়ার মানুষ শিকার করতে।

সাদা চামড়ার মানুষদের কাছে কালো মানুষ জানোয়ার। তুই একটা জানোয়ার, সে এবার নিজেকে নিজে বললো। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো। নিজের হাত পা দেখতে থাকলো। হাত পা দেখে নিজেকে জানোয়ার ভাবতে পারছে না। নিজেকে তার মানুষ বলে মনে হচ্ছে।

এবার সে নিজের ছায়ার পানে তাকালো। তার পায়ের কাছ থেকে আর একটা কালো মানুষ শুয়ে আছে। এইত আর একটা মানুষ। এই মানুষটার সঙ্গে কথা বলতে পারে। অবশ্য ছায়া-মানুষ জবাব দিতে পারে না। নাই বা দিল, তাই বলে কি তাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যায় না? নিশ্চয় প্রশ্ন করা যায়।

সে এবার তার ছায়াকে জিজ্ঞাসা করলো, হাত, পা আছে সে

মানুষ নয়? হাত, পা, মুখ থাকলেইতো একটা মানুষকে মানুষ বলা যায়।

শনিয়ালালের কথা তার মনে এল। আপন মনে মাথা নাড়লো। শনিয়ালালকে সে মানুষ বলে স্বীকার করতে পারছে না। হাতের লগুড় সে উঁচু করে ধরলো। শরীরের সব শক্তি সংহত করলো হাতের মুঠোতে। সামনের পাথরের উপর আঘাত করলো। এক ডেলা থুথু ফেললো।

তবু সে থামলো না। সে দৌড়ে গিয়ে একটা গাছের নিচে দাঁড়ালো। গাছের ডালে জোরে আঘাত করলো।

লগুড়ের প্রচণ্ড আঘাতে গাছের ডাল ভেঙ্গে নিচের দিকে ঝুলে নেমে এল। অনেকগুলো সবুজ পাতা ছিড়ে নিচে পড়ল। সে বিস্ফারিত চোখে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া পাতার দিকে তাকিয়ে রইল। ছিঁড়ে যাওয়া পাতাগুলোকে অদ্ভুত মনে হল তার। এতদিন ধরে এতবার দেখা সবুজ পাতা আর সবুজ পাতা নয়। গাছের ছেড়া পাতা রূপ বদলে ফেলেছে। পাতাগুলো এখন চোখের মত। গাছের চোখ। তার পানে তাকিয়ে আছে। নিরব চোখে তাকিয়ে থেকে কি যেন বলছে।

কি বুইলছিস তুরা, সে ফিস ফিস করে প্রশ্ন করলো।

কোন জবাব এল না। ছেঁড়া পাতাগুলো একভাবে মাটিতে পড়ে আছে। পর পর শুয়ে আছে কতগুলো মৃত প্রাণ। মমতায় তার মন ভরে গেল। গাছের পাতাগুলিকে বড় আপন মনে হচ্ছে এখন। কারো সাতে পাঁচে থাকে না। নিজের মত করে বেড়ে ওঠে, চারিদিকে সবুজ রং ছড়িয়ে দেয়। মাটিতে ছায়া ফেলে। পাখীরা এসে বাসা বাঁধে। ফুল ফোটে, ফল হয়। পাখী ফল খায়। মানুষ এসে নিয়ে যায়। গাছ কখনো বাধা দেয় না।

গাছ দেবতার মত সে আপন মনে সিদ্ধান্ত নিল। নিজের ক্ষেতখানার কথা মনে এল। চোখের সামনে দেখতে পেল মকাইয়ের নধর গাছ-গুলিকে। মকাইয়ের ক্ষেতের পাশে ধানের ক্ষেত—একের পর এক

ফলন্ত ক্ষেত তার চোখের সামনে সজীব হয়ে উঠলো।

এই সবুজ ক্ষেত, আর বন, এরা হল নিজের মায়ের মত। সে দূরের দিকে তাকালো। বন সবুজে সবুজ। বোঙাঠাকুর সব কিছু সুন্দর করে তৈরী করে দিয়েছিল মানুষের জন্য। অথচ দীকু আর সাদা চামড়ার মানুষ—তার বুক চিরে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

আবার পাথরখানার উপর গিয়ে তার বসার ইচ্ছা হয়েছিল। রোদের মধ্যে বসলে ভিতরের মানুষটা বাইরে বেরিয়ে এসে পাশে বসে থাকে। তখন তার সঙ্গে কথা বলা যায়।

পাথরখানার কাছে গেল না। এখন তার জল চাই। গতকাল একটা ঝর্ণা পার হবার সময় পেট পুরে জল খেয়ে নিয়েছিল। তখন নিচু হতে গিয়ে কি কষ্ট। পিঠের যন্ত্রণা আবার ফিরে এসেছিল। তারপর পিঠের যন্ত্রণার কথা ভুলে যায়। এখন বুকের মধ্যে কষ্ট। তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যেতে চাইছে।

সে থুথু এনে গিলে খাচ্ছে। গলা ঠিক মত ভিজছে না। মুখের গহ্বর শূণ্য বলে মনে হয়। তখন অনেক ফল খেয়েছিল। এখন সেই ফলের স্বাদ ভয়ানক বিস্বাদ হয়ে উঠেছে। গলা যেন এখন রোদের ভিতর শুকোতে দেওয়া কাঠ। কাঠখানা রোদের তাপে আরো শুকিয়ে যাচ্ছে।

জল চাই। জলের তৃষ্ণা তার বুকের মধ্যে নেমে যাচ্ছে। সামনের দাঁড়িয়ে থাকা গাছগুলিকে এখন সে মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করছে। চোখে গভীর অনুসন্ধানী দৃষ্টি। গাছ, গাছের পাতা বলে দেবে জলের খবর। গাছ নির্দেশ দেবে তুমি ডানে যাবে না বাঁয়ে যাবে। গাছের রং, পাতার রং জলের নির্ভুল নিশানা দিতে পারে।

দুপুরের রোদ তীব্র। সে হেঁটে চলছে বিশাল গাছের ছায়ায় ছায়ায়। রোদ বর্শার ফলার মত এসে গাছের পাতার ওপর বিঁধছে। গাছ সব রোদ পাতা দিয়ে আটকে রেখেছে। বনের মধ্যে ছায়া। নিচের মাটি শুকনো। সঞ্চিত জল গাছগুলি শুষে খেয়ে নিয়েছে।

সহজে জল পাওয়া যাবে না, মানুষটি তা জানে। এখন সে পাহাড়ের খাড়াইয়ের কাছে। বর্ষার জল পাহাড় থেকে নিচে নেমে যায়। খানাখন্দে কিছু জল জমে থাকে। এখন খানাখন্দগুলোও শুকনো।

নিরাশ হল না, নিরাশ হলে তার চলবে না। এক একটা সময় আসে যখন নিজের যা যা দরকার সে সব নিজেকেই করে নিতে হয়। এখন তাকে খুঁজে পেতে হবে—এই হল শেষ কথা। অন্য আরো যা যা দরকার সে সব কথাগুলি ভুলে থাকাই ভালো।

তৃষ্ণা গলা বেয়ে বুকের মধ্যে নামছে। এই তৃষ্ণা একটা ডাইনীর মত। সে তোমাকে ধরে নিয়েছে। এখন একটু একটু করে কলজের রস শুষে খাবে। রস খেয়ে খেয়ে বুক ঝাঁঝরা করে দেবে। সে যদি জল না পায় তবে কাঠ হয়ে যাবে পাথরের ফাঁকে গজিয়ে ওঠা গাছের মত। গাছটা দাঁড়িয়ে আছে অথচ ডাল পালায় একটাও পাতা নেই—জ্বালানী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

তুই এখন জ্বালানি কাঠ হবি, সে নিজেকে নিজে প্রশ্ন করলো। তার ভিতর থেকে কোন উত্তর উঠে এল না। চোখের সামনে একটা জলের জায়গা ভেসে উঠলো। জলের জায়গাটা তাদের গাঁয়ের উত্তরে। ধান ক্ষেত পার হয়ে সামান্য উৎরাই থেকে চড়াইতে চাপতে হয়। পথের ওপর পড়ে আছে বিশাল কয়েকখানা পাথর। পাথরের পেছনে আছে সেই জলের জায়গা।

বুনো আতাগাছের জঙ্গল। তার মাঝখান দিয়ে এঁকেবেঁকে চলছে পায়ে চলার পথ। চড়াইয়ের শেষ প্রান্তে সমতলভূমি। সেখানে কালো পাথর ক'খানা জল আড়াল করে রেখেছে।

. গামলার মত একটা খোদল। খোদলে জল সঞ্চিত হয়ে আছে। কোথা থেকে জল আসে কারো জানা নেই। সারা বছর জল থাকে। আকাশে যখন আগুন জ্বলে, পুকুর যখন শুকিয়ে যায়, কাকগুলো জলের জন্য কা-কা করে তখনো জল থাকে। গাঁয়ের মেয়েরা কলসী ভর্তি করে জল তুলে আনে।

ছুটিয়া জল আনতে গিয়েছিল। ছুটিয়ার কথা মনে আসতেই তার পা থেকে, পেট থেকে, বুকের মধ্যে যত রক্ত থাকে সব উঠে আসতে শুরু করেছে মাথায়। নাক ফুলে উঠেছে। চিবুক এখন পাথরের মত শক্ত। কি যেন তার করতে ইচ্ছে করছে-ভয়ঙ্কর কিছু একটা। কি করবে?

তৃষ্ণা। বুক ভরে আছে তৃষ্ণায়। গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। চোখ দুটো ঠিকরে বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

এই চোখ দুটিকে দিয়ে ছুটিয়া সুখনকে ভালোবাসার দৃষ্টিতে দেখেছিল। মোষ নিয়ে ফিরে আসবার পথের পানে তাকিয়ে থাকতো। ছুটিয়ার চোখ দুটো পাখীর লেজের মত ছটফট করতো সব সময়।

ছুটিয়ার সেই চোখ দুটি আর ছুটিয়ার হয়ে থাকছে না। তার পেটের মধ্যে লাঙ্গল মাটি আঁচড়ে দিচ্ছে। লাঙ্গলের ফালা ক্রমশ গভীর হয়ে বসে যাচ্ছে। পেটের মাটি উল্‌টে পাল্‌টে দিচ্ছে। ছুটিয়ার দাঁতে দাঁতে লেগে আছে। পাগলের মত চাটাই খামচে ধরছে। এক একবার চিত হয়ে শুয়ে হাঁটু দিয়ে পেটের উপর পা দিয়ে চাপ দিচ্ছে। আবার কাত হয়ে যাচ্ছে। তলপেটে তীর বিঁধে থাকা শূকর হয়ে ছটফট করছে আর হাতের কাছে যা পাচ্ছে তাই আঁকড়ে ধরছে।

ছুটিয়া আর পারছে না। গলা শুকিয়ে কাঠ। দাঁতে দাঁত লেগে আছে—একটু হাওয়া। নাকের ছেদা বন্ধ। ছুটিয়ার পৃথিবী এখন হাওয়াহীন। ছুটিয়া সবার চোখের আড়ালে শনিয়ালালের লোভের ফসল ফেলে দিতে চাইছে। পারছে না। দাঁতে দাঁত লাগিয়ে তলপেটে থেকে শনিয়ালালের ভূত ফেলে দিতে পারছে না। শনিয়ালালের শয়তান আলোর মুখ দেখছে না।

ছুটিয়া শিকড় বেটে খেয়েছিল। পেটের মধ্যে শনিয়ালালের ভূত সে রাখবে না। শেষ পর্যন্ত শনিয়ালালের ভূত সে বাইরে বের করে দিতে পারেনি। থকথকে রক্তের মধ্যে কুঁকড়ে মরে পড়ে ছিল ছুটিয়া।

রক্তের মধ্যে কুঁকড়ে থাকা ছুটিয়াকে সবাই দেখলো। বুঝলো সব।

কিন্তু একটা মানুষ পাওয়া গেল না যে কথা বলবে। ভয়ে সব পাথর হয়ে দেখছে।

এবার সে দাঁড়িয়ে পড়লো। শনিয়ালালরা অজগর হয়ে গাঁয়ের কত মেয়ে মানুষ গিলে খেয়েছে তাদের কথা মনে এল। অনেক মেয়েকে সাদা চামড়ার মানুষদের দিয়ে দিয়েছে। তারা আর ফিরে আসেনি। সাদা চামড়ার মানুষরা গিলে খেয়ে ফেলেছে।

শালা দানো, সে অস্ফুট স্বরে বললো। দানোটাকে খুন করেছে। টাঙ্গী বিঁধেয়ে দিয়েছে শনিয়ালালের গলায়। শনিয়ালাল পড়ে আছে রাস্তার ওপর। ঘোড়াটা পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

সে বুক ভর্তি করে বাতাস নিল। তৃষ্ণা তাকে আর কাতর করতে পারছে না।

চোখ তার জ্বলে উঠলো। এতক্ষণে জলের রেখা খুঁজে পেয়েছে। জল নেই, আছে জল নেমে যাবার পথ। নালি বেয়ে পাহাড়ের জল নিচের দিকে নেমে যায়।

হাঁটতে হাঁটতে খাদের সামনে চলে এল। এবার খাদের মধ্যে নেমে গেল। খাদ ক্রমশ গভীর হচ্ছে। আরো খানিকটা পথ তাকে হাঁটতে হল। এবার আর্দ্র মাটি পেল। অমনি তৃষ্ণা বেড়ে গেল। গলা এখন আবার খস্ খস্ করছে। পায়ের নিচে সুতোর মত জলের রেখা। তার জিভ ভিজে। এতক্ষণে নিজের ভিতর জলের হদিস পেল। মুখের মধ্যে জিভ নাড়তে থাকলো।

এবার সে জল পেল। নালার মাঝখানে খানিকটা জল জমে আছে। সে হাঁটু ভেঙ্গে বসলো। এখন আর তার কোন কষ্ট নেই। মুখের সামনে জল। লগুড় পাশে শুইয়ে রেখেছে। দুটো হাত জলের মধ্যে। হিমার্ত এক স্পর্শের সুখ হাত বেয়ে শরীরে উঠে আসছে। দু'হাতের আজলায় জল নিল। মুখ জলের কাছে নিয়ে জল পান করতে শুরু করলো। ঠোঁট ভেজা, চিবুক জলের মধ্যে। জিভে জল। জল গলা ভিজিয়ে

নিচের দিকে নামছে। জল নয় প্রাণ। তার প্রাণ একটু একটু করে ফিরে আসছে।

পেট ভর্তি করে জল খেল। জলে মুখ ভেজালো। সারা গায়ে জল দিল। শরীর ঠাণ্ডা হল। সে আরো জল গায়ে মাখলো। স্বস্তি তাকে এখন আচ্ছন্ন করে ফেলছে। পাথরের ওপর পা ছড়িয়ে দিল। এবার পা ছড়িয়ে বসে একটু বিশ্রাম নেবে। ইচ্ছে করছে শুয়ে পড়তে। সারা শরীরে তন্দ্রার আবেশ। চোখ জড়িয়ে আসছে ঘুমের নেশায়।

মাটির ওপর টান টান হয়ে শুয়ে পড়লো। তার পাশে শুয়ে আছে তার আপন হাতে তৈরী লগুড়। ঝির ঝির করে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে। কে যেন গায়ে পালক বুলিয়ে দিচ্ছে।

হাওয়া থমকে দাঁড়ালো। এবার সে গন্ধ পেল। গন্ধ ছিল, সে লক্ষ্য করেনি। এবার গন্ধ টের পাচ্ছে। অমনি সব ইন্দ্রিয় সজীব হয়ে উঠলো। এক ঝটকায় উঠে বসলো। আপনা থেকে হাত চলে গেল লগুড়ে। শক্ত করে লগুড় চেপে ধরলো।

উঠে দাঁড়ালো। উঠে দাঁড়াতেই হাতীর পুরীষ দেখতে পেল। চমকে উঠলো নিজের কথা ভেবে। তার সামনেই হাতীর পুরীষ। অথচ এতক্ষণ দেখতে পায় নি। চোখ চোখের কাজ করে নি। নাক নাকের কাজ করে নি। এখন পুরীষের গন্ধ তীব্র। পুরীষ গরম। একটু আগেই এখানে একটা হাতী দাঁড়িয়ে ছিল। হাতীর পায়ের ছাপ স্পষ্ট।

হাতী ডান দিকে চলে গেছে। দূরে কোন ঝোপের আড়লে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে লক্ষ্য করছে। সে কি কি করছে তাই দেখছে। সে শিউরে উঠলো।

দলছুট হাতী, সে ভাবলো। হাতীটা তার মত আর একজন। এখানে জল খেতে এসেছিল। মনে মনে বললো, তুই আমার বন্ধু হলেও ভয়ঙ্কর বন্ধু। দলছুট হাতী কি না করতে পারে?

এবার ভুল ভাঙলো। একটি হাতী নয় কয়েকটি হাতী এসেছিল জল খেতে। পাথরের খাঁজে জল জমে আছে। জল বোধহয় সারা বছর থাকে। খাদের মধ্যে আপনা থেকে জল আসে। পাহাড়ের বুকের মধ্যে জল থাকে সেই জল চুপিচুপি এসে খাদ পূর্ণ করে রাখে। যত তুমি পার জল নাও—খাদ শুকবে না। পাহাড়ের দেবতার করুণার অকৃপণ দান।

এবার তার চোখ সহজ হল। তার পায়ের কাছে অনেক পায়ের ছাপ। হরিণ আর ভল্লুকের পায়ের ছাপ দেখতে পেল। ভল্লুকের পায়ের ছাপ বেশী। হাতীর আগে এক জোরা ভল্লুক এসেছিল।

হাঁটু থর থর করে কেঁপে উঠে স্থির হল। জল খুঁজতে খুঁজতে বুনো জানোয়ারের আড্ডায় এসে পড়েছে সে। এখান থেকে সরে যেতে হবে এখনই। একটা লগুড় হাতে নিয়ে হাতী বা ভল্লুকের মুখোমুখি হওয়া যায় না। হাতীকে কৌশলে এড়িয়ে যাওয়া যায়। পায়ের সামনে হাতীর পুরীষ পড়ে আছে। গায়ে মেখে নিলে হাতী তাকে মানুষ বলে নাও ভাবতে পারে। সে একটা গাছের ওপর উঠে বসে থাকতে পারে। হাতী আর গায়ের গন্ধ পাবে না। হাতী বনের মধ্যে মানুষ সম্পর্কে সচেতন নয়। কিন্তু ভল্লুক?

অপরিচিত গন্ধ পেলেই ছুটে আসবে। ভল্লুক হিংস্র এবং নির্বোধ। আক্রমণ করার আগে কিছু ভাবে না। ঝাঁপিয়ে পড়ে। নিজে মরবে অথবা মারবে। অন্য কোন বুদ্ধি ভল্লুকের মাথায় আসে না। তাই গাঁয়ের বুড়োরা ভল্লুক শিকার করতে দেয় না। তুমি জঙ্গলে যাও—হরিণ, শম্বর, শুয়োর যা পার শিকার করে আন। ভল্লুকের আস্তানার কাছে ঘেঁষ না।

সে আর দাঁড়ালো না মৃত্যুর রাজ্যে।

শ্রান্ত হয়ে একটা গাছের নিচে বসলো। নিজেকে অদ্ভুত মনে হল তার। এমন ভাবে দৌড়লো কেন? জলের জায়গায় বনের

জানোয়ার আসে, জল পান করে শিকার করে না। অরণ্যের এই হল নিয়ম। নয়তো বনের মধ্যে জলের জায়গা পরিণত হত শিকার ক্ষেত্রে।

শিকারের এমন সহজ সুযোগ বনের জানোয়ারেরা নেয় না। জঙ্গলের নিয়ম নীতি মেনে চলে। এ সব কথা বস্তির বুড়োরা জানে।

তার মনে এল ডকরুর কথা। ভয়ানক সাহসী জোয়ান। শিকার করতে গিয়ে দলছুট হয়েছিল। সেটা ছিল কোন পর্ব? সাকরাৎ পর্ব। আকাশে ছিল গোল চাঁদ। তারা ছোট ছোট দল তৈরী করে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে ছিল।

বনে ঘুরে ঘুরে শিকার করে ফিরে এসেছিল। ডকরু ফিরতে পারেনি। একা একা শিকার করবে বলে একটা সাদা ফুটকী দাগের হরিণের পিছু নিয়েছিল। হরিণ পথ ভুলিয়ে তাকে দল থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে।

শুরু হল ডকরুর একা শিকার করার লোভের শাস্তি। একা একা ঘুরে অনেক কষ্টে আবার বস্তীতে ফিরে আসতে পেরেছিল। সঙ্গে ছিল একটা ভল্লুকের বাচ্চা। সেটাও ছিল দলছুট। ডকরু সাহস করে ধরেছিল। নিয়ে এসেছিল গাঁয়ে গাঁও বুড়ো ক্ষেপে লাল হয়েছিল। হারিয়ে যাওয়া বাচ্চাটো ধইরে আনলি? উ কি তুর খাবার হয়ল বটে এরেলিংকোড়া? তু ডাকু আছিস বটে। মোদের দিশামে তুর ঠাঁই হবেক নাই।

ডকরু ফের ভল্লুকের বাচ্চাটা নিয়ে বনের মধ্যে গিয়েছিল। বাচ্চাটা রেখে এসেছিল তার আস্তানায়। তাতেও গাঁও বুড়োর রাগ পড়েনি। হাতের পাচনকাঠি দিয়ে পিটিয়ে ছিল যতক্ষণ বুড়োর দম ছিল। আর সে কিনা হাতীর পুরিষ আর ভল্লুকের পায়ের ছাপ দেখে দৌড়ে দৌড়ে…

দু'দিন ধরে সে শুধু দৌড়চ্ছে। প্রথম তাড়া করেছিল শনিয়া-লালের লোকেরা। তারপর থেকে সে নিজেকে নিজে তাড়িয়ে

বেড়াচ্ছে আর দৌড়চ্ছে। এখন বিশ্রাম নেওয়া দরকার। খাবার মত কোন খাদ্য খায়নি। যত দিন যাচ্ছে তার কলজের শক্তি কমে যাচ্ছে।

সে বিশাল গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসলো। পা দুটো সামনের দিকে ছড়িয়ে দিল। এবার তার পায়ের কথা মনে এল। এত সময় পা দুটোর কথা কখনো মনে আসেনি। পায়ের কথা ভাববার কোন দরকার ছিল না। পা পায়ের কাজ করেছে। তার মন যখন যা চেয়েছে পা তাই করেছে।

এখন বুঝতে পারছে পায়ের ওপর অতিরিক্ত অত্যাচার করেছে। পা এখন তার অস্তিত্ব জাহির করতে চাইছে। পা মেলে দিতেই টন্ টন্ করে উঠেছে। গাঁটের হাড়ের মধ্যে অদৃশ্য এক পোকা তার ধারালো দাঁত দিয়ে কুরে কুরে খাচ্ছে।

গভীর মমতার সঙ্গে হাত দু'খানাকে পায়ের ওপর রাখলো। এই দু'খানা পা আমার, সে আপন মনে বিড়বিড় করে বললো। ইচ্ছে হল পা দুটিকে হাত বুলিয়ে আদর করে। কিন্তু যা ভাবছে তা করা হচ্ছে না। এখন মাথা আপনা থেকে বুকের ওপর নেমে আসছে। গা বেয়ে ঘাম নেমে যাচ্ছে। শ্রান্তিতে এখন গল গল করে ঘামছে, এত ঘামছে যে মাথার চুল পর্যন্ত ভিজে যাচ্ছে।

তার কোমরে এক ফালি কাপড়। কোমরে কষে বাঁধা আছে। সে কাপড় ভিজে সপ সপ করছে। সে কাপড়ের ফালি কোমড় থেকে খুলে নিল। কাপড়ের ফালি দেখলো। গায়ের ঘাম পুছলো। ঘাম পুছে আবার কাপড়ের ফালি দেখলো। কাপড়ের ফালিটিকে মনে হল অদ্ভুত। অকারণে কাপড়ের ফালি সে টেনে বেড়াচ্ছে কেন?

এখন আর দরকার নেই, সে আপন মনে ভাবলো। গাঁয়ে থাকলে এক ফালি কাপড় দরকার হয়। জানুসন্ধির মাঝখানে আছে লাল ঠোঁটের কালো পাখী। তার গতি প্রকৃতি সব সময় বোঝা যায়

না। অদ্ভুত তার আচরণ। কখন যে ডানা ঝাপটিয়ে ছটফট করে উঠবে তা বোঝা যায় না। আর একবার ডানা ঝাপটে জেগে উঠলে তাকে সামলানো মুসকিল। কোন হুকুম মানবে না। তাই লাল ঠোঁটের কালো পাখীটাকে ঢেকে রাখতে হয়। কিন্তু বনের মধ্যে তার কোন প্রয়োজন নেই।

সে কাপড়ের ফালি ছুড়ে ফেলে দিল। মনে পড়ল সাদা চামড়ার মানুষদের কথা। তারা অনেক জামা কাপড় পরে। একটা কাপড়ের ওপর আর একটা কাপড় চাপায়। গা আর দেখতে পাওয়া যায় না। সাদা চামড়ার মানুষরা পা থেকে হাঁটু পর্যন্ত চামড়া দিয়ে ঢেকে রাখে। মাথার চুলগুলি লুকিয়ে রাখতে একটা বাঁকা টুপি চাপায়। অদ্ভুত। এ সবের কি দরকার?

এখন সে নগ্ন। নগ্ন হয়ে বসে আছে গাছের নিচে। ভিতরের মানুষটা পাশে বসে নেই। পাশে বসে থাকলে কথা বলতে পারতো। নাইবা থাকলো। ভিতরের মানুষটাকে সব সময় কাছে বা পাশে পাওয়া যায় না। নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলা যায়। দু পাশে হাত ছড়িয়ে দিল। মাথা নেমে আসছে বুকের ওপর। নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলার মত ইচ্ছা আর নেই। এখন ক্লান্তিতে তার চোখ বুজে আসছে।

বনের মধ্যে অন্ধকার নেমে আসতে শুরু করেছে। সূর্যাস্তের আয়োজন পশ্চিম আকাশে। রঙ লাল। গাছের নিচে বসে আকাশ দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু টের পেয়েছে যে রাত্রি আসছে। বুকের সাহস কমে যাচ্ছে। সে এখন অনুভব করতে পারছে নিজের অসহায় অবস্থা। যত বুঝতে পারছে তত কুঁকড়ে যাচ্ছে। এখন সে কুঁকড়ে যাচ্ছে নিজের মধ্যে।

এবার সে চাইছে নিজের ভিতরকার মানুষটাকে। সে আবার বাইরে বেড়িয়ে এসে দাঁড়াক তার সামনে। তার চুপসে যাওয়া

বুকখানা ফিরিয়ে দিক আগে যেমন ছিল।

ভিতরের মানুষটি বেরিয়ে আসছে না। তার আসা যাওয়া তার আপন ইচ্ছায়। তাকে চাইলেই পাওয়া যায় না। ভিতরের মানুষটা চলে চান্দোবোঙার নির্দেশে। তুমি চাইলেই তাকে পাবে এমনটি নাও হতে পারে।

রাত্রির অন্ধকারে বন আরো বিপজ্জনক। যে কোন মুহূর্তে তুমি শিকার হয়ে যেত পার। অন্ধকার, চারপাশে ঘন অন্ধকার। অন্ধকারের মধ্যে মৃত্যু ওৎ পেতে বসে থাকে। যে কোন মুহূর্তে সে তোমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। গাছের পাতা এখন স্থির হয়ে আছে। তার সামনেই পাথর। মাটি ঠেলে উঠে গর্বিত ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা দু'চোখ মেলে বসে আছে। আলো অন্ধকার যা হোক—ওরা দেখতে পায় অরণ্যের সব রকমের হত্যা কাণ্ড। গাছ, পাথর কোন প্রতিবাদ করে না, নীরবে দেখে

মৃত্যুকে এবার দেখতে পাচ্ছে মানুষটি। মৃত্যুর থাবা তার সামনে, তার পাশে, তার পিছনে। চারপাশে মৃত্যুর থাবা উদ্ধত হয়ে আছে। অন্ধকার তো নামছে। অন্ধকার যত ঘন হচ্ছে তত তার দৃষ্টি শাণিত হয়ে উঠছে। সে চারপাশের গাছপালা লক্ষ্য করছে। বড় বড় গাছগুলো নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকারে গাছের শরীরগুলো জট পাকিয়ে যাচ্ছে। সে অন্ধকারের মধ্যে একটা গাছের শরীর জরিপ করছে। একটা গাছ তাকে এখন বাছাই করে নিতে হবে। বাছাই এবং নির্বাচন জরুরী।

এখন সে বেঁচে থাকার অর্থ বুঝতে পারছে। বেঁচে থাকার অর্থ প্রতিনিয়ত বাঁচার জন্য লড়াই করে যাওয়া। এ সব ভাবনা এর আগে কখনো তার মনে আসেনি। বেঁচে থাকা আর মরতে পারা নিয়ে কখনো কিছু ভাবেনি। এখন সে অনেক কিছু বুঝতে পারছে যা আগে বুঝতো না। বেঁচে থাকা মানে হল যুদ্ধে জিতে যাওয়া। চারপাশে ওৎ পেতে থাকা মৃত্যুর থাবাকে ফাঁকি দেওয়া।

উঠে দাঁড়ালো। পায়ের গাঁটে যন্ত্রণা আছে। ঝিন্ ঝিন্ করে যন্ত্রণা মাথার মধ্যে উঠে আসছে। সে গ্রাহ্য করলো না। লম্বা লম্বা পা ফেলে লগুড় নিয়ে গাছটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। গাছটার অনেক বয়স হয়েছে। অন্ধকারেও তার দৃষ্টি সচল। বুঝতে পারছে গাছটা কত বুড়ো। সারা গায়ে আঁকা বাঁকা রেখায় বয়সের হিসাব। বাকল শুকনো। অনেক জায়গার ছালবাকল শুকিয়ে খসে গেছে।

গাছটার ওপরে ওঠা সহজ নয়। সে ইতস্ততঃ করতে থাকলো। কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারছে না। অন্য আর একটা গাছের কাছে যাবে কিনা ভাবছে না। নির্দিষ্ট গাঁছটায় কি ভাবে ওঠা যায় তাই ভাবছে। লগুড় মাটির ওপর শুইয়ে রেখেছে। এবার তাকে গাছটায় উঠতেই হবে।

বনের মধ্যে এবার আলোর আভাস এল। দিগন্তে উঠেছে বিশাল চাঁদ। গাছের ডাল পালার ফাঁক ফোঁকর গলে আলো আসছে। এখন গাছটাকে আরো স্পষ্ট করে দেখতে পাচ্ছে। যত স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে তত নিজের মধ্যে ভরসা জাগছে। এ গাছ নিরাপদ। চিতার সাধ্য নেই যে নিঃশব্দে ওপরে উঠে যাবে।

হঠাৎ পচা গন্ধ নাকে এলো। সঙ্গে সঙ্গে সে গাছের ফোকরের মধ্যে গিয়ে লেপ্টে দাঁড়ালো। লগুড় শক্ত করে ধরে রাখলো হাতের মুঠোয়। মাটিতে পায়ের থাবা গেঁথে রুখে দাঁড়ালো। পচা গন্ধ তার কাছে এল না। দূরে সরে মিলিয়ে গেল। এবার সে বাইরে এসে দাঁড়ালো। পচা গন্ধ কোন হিংস্র জানোয়ারের খবর জানিয়ে দিয়ে গেল। সে হাওয়ার উল্টো দিকে ছিল বলে খতনার জানোয়ার টের পায় নি।

মোটা গাছটাকে আবার সে পরীক্ষা করলো। প্রথম ডাল প্রায় চার চারটা মানুষের মাথার উপর। বিশাল উঁচু গাছটায় ওঠার একটা পথ পেতে হবে।

গাছটাকে ঘুরে পাক খেতে গিয়ে লতাটাকে দেখতে পেল।

একটা অজগরের মত গাছটাকে পাক খেয়ে ওপরে উঠে গেছে। গাছটার গায় এমন ভাবে লেপ্টে আছে যে তাকে আলাদা করে চেনা শক্ত।

লতাটাকে দু'হাতে সে চেপে ধরলো। গায়ের শক্তি দিয়ে হ্যাচকা একটা টান দিল। গাছের শরীর থেকে লতা সরে এল। লতা মোটা এবং শক্ত। সে আবার টান দিল। লতা গাছের শরীর থেকে আল্গা হয়ে ঝুলতে থাকলো। সে আবার টানলো। লতা নিচে নেমে এলো না। লতা গাছের ওপরে উঠে ডালে ডালে জড়িয়ে অনেক জট পাকিয়েছে। বুড়ো গাছটাকে মেরে ফেলে তার ওপর নিজে নিবিড় হয়ে সূর্যের তাপ গিলে নিজেকে বেশ পুষ্ট করে তুলেছে।

লতা ধরে এবার সে ওপরে উঠে যেতে পারবে। ভোর হলে আবার নিচে নেমে আসবে। ভাগ্যে থাকলে দু' একটা পাখীর বাসা পেয়ে যেতে পারে। বাসার মধ্যে আছে উষ্ণ ডিম।

ভয় কেটে গেল। বুকে ফিরে পেল হারিয়ে যাওয়া শক্তি। লগুড়টাকে গাছের সঙ্গে ঠেস দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখলো। লতা ধরে ওপর দিকে উঠতে শুরু করলো।

লতা ধরে গাছের সঙ্গে পা ঠেকিয়ে উঠতে কষ্ট হচ্ছে। গাছের গায়ে পা রাখলেই ছাল বাকলা খসে যাচ্ছে। অমনি পা পিছলে যেতে চাইছে। তাতে ঘাবড়ে যাচ্ছে না। একের পর আর এক অন্তরায় অতিক্রম করতে পারার নাম হল জীবন।

লতা ধরে ধাপে ধাপে সে ওপরে উঠছে। প্রায় আট মানুষের মত ওপরে উঠে এসেছে। আরো ওপরে উঠতে হবে। তবে পাবে গাছের প্রথম ডাল। আর একটু। তাকে উঠতেই হবে ভারসাম্য রক্ষা করে। আর সামান্য উঠতে পারলেই বসার মত জায়গা পাবে। শুধু বসে থাকা নয় শোওয়াও যাবে। হাতের কাছের ডাল কত মোটা—দু' মানুষের মত মোটা। গাছের খাঁজে পিঠ গুঁজে দিয়ে দুটো পা দু'দিকে ছড়িয়ে দিতে হবে। তারপর ঘুম লাগাও।

তার মুখের সামনে গাছের একটা ফোকর। সে অন্ধকারে ফোকর দেখতে পায় নি, লক্ষ্য করে নি।

তার উপস্থিতি টের পেয়ে ফোকর থেকে বেড়িয়ে এল একটা সাপ। তার সামনে একটা মানুষের মাথা। সাপ ভয় পেয়ে ফণা তুললো। হঠাৎ সাপের ফণার মুখোমুখি হয়ে সে ঘাবরে গেল। পা গাছ থেকে ফসকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে লতা শক্ত করে চেপে ধরলো। সে লম্বা হয়ে লতার সঙ্গে ঝুলছে। সে গাছের সঙ্গে আবার পা ঠেকাতে গেল। ফস করে শূন্যে সাপ ছোবল মারলো। সামান্যতম অসতর্কতায় তার হাত ফসকালো।* তার শরীর শূন্যে একটা পাক খেয়ে সোজা নেমে এল নিচে।

একটা বিকট শব্দ বেরিয়ে এল গলা থেকে। পা পড়েছে গাছের শিকড়ের উপর। বুক গাছের সঙ্গে ঘষে গিয়ে রক্তাক্ত।

হাঁটুতে প্রচণ্ড জোরে লাগলো। এত জোরে লেগেছে মনে হল কে যেন একটা টাঙ্গী সমূলে গেঁথে দিয়েছে মাথার মাঝখানে। একবার নয় বারবার। টাঙ্গী মারছে আবার তুলে নিচ্ছে। সে কয়েকবার আর্তনাদ করে স্তব্ধ হয়ে গেল।

সে উঠে দাঁড়াতে চাইল, দাঁড়াতে পারলো না। পা আর সোজা করতে পারছে না। পায়ে নাড়া লাগলেই মাথার ভিতর ঝন্ ঝন্ করে উঠছে। আবার সে বসলো। পাখীরা ডাকাডাকি করছে। বনের মধ্যে যে কত রকম পাখী আছে তার কোন হিসাব নেই। সে পাখীর ডাক শুনছে না। দাঁতে দাঁত লাগিয়ে চোখ বন্ধ করে বসে আছে।

এক সময় পায়ের যন্ত্রণা, মাথার মধ্যে টাঙ্গীর হাঁকড়ানো কোপ কমে গেল। এখন বুকে জ্বালা অনুভব করছে। বুকে হাত রাখলো। তার নিজের বুক। বুকের কয়েক জায়গার ছাল চামড়া উঠে গেছে। হাতের সঙ্গে এল জমাটবাধা রক্ত। হাতের তালু পাছার ওপর ঘষে নিল। আবার বুকে হাত রাখলো। এবার

হাতের তালুতে এল তাজা রক্ত।

সে হাত চেটে পরিষ্কার করলো। রক্ত জমিয়ে দেবার জন্য ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। তাজা রক্তের গন্ধ বনের মধ্যে অনেক দূরে চলে যায়। অন্য আর এক বিপজ্জনক সম্ভাবনা টেনে আনে। বনের জানোয়ারদের ঘ্রাণশক্তি তীব্র! রক্তের গন্ধে তারা উল্লাস বোধ করে। গরম রক্ত মাথায় খুনের নেশা জাগিয়ে দেয়। জিভ থেকে লালা বেরিয়ে আসে।

সে একটু একটু করে বুকের তাজা রক্ত আঙুল দিয়ে পুছে জিভ দিয়ে চেটে খেয়ে নিল। নিজেকে টানতে টানতে নিয়ে গেল আবার গাছের কাছে। গুড়ির গায়ে বিশাল ফোকরের মধ্যে নিজেকে ঢুকিয়ে দিল। পা দুটো ঢুকলো না। ডান পা খানা ভাঁজ করে বুকের কাছে নিয়ে এল। বাঁ পা খানা টান টান হয়ে থাকলো ফোকরের বাইরে। লগুড়টাকে শুইয়ে দিল টান টান হয়ে থাকা পায়ের পাশে।

সে জেগে বসে থাকতে চেয়েছিল। কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে নিজেই জানতে পারে নি। জঙ্গলের মধ্যে মাটির ওপর কোন মানুষ ঘুমিয়ে থাকতে পারে না। সে ঘুম হবে জীবন নিয়ে এক অহেতুক জুয়া খেলা। এ সব কথা সে জানে। তবু ঘুমিয়ে আছে। তার পিছন দিকে আড়াল আছে। ডান ও বাঁয়ের দিক অনেকটা নিরাপদ। কিন্তু সামনের দিক খোলা। বাঁ পাখানা গুঁড়ির বাইরে টান টান করে পাতা আছে।

জঙ্গলের চরিত্র সে জানে। তাদের বস্তীর পাশেই জঙ্গল। বাঘ, নেকড়ে, শেয়ালদের হাত থেকে গরু, ছাগল, মহিষদের রক্ষা করতে হয়। কখনো বস্তীর কাছে হাতীর পাল চলে আসে। ধান, মকাইর খেতে নেমে লণ্ড ভণ্ড করে দেয় এক রাত্রে। তখন তারা সারা রাত জেগে বসে থাকে মশাল জ্বেলে। মাদল বাজিয়ে গাঁয়ের মানুষদের জাগিয়ে রাখে।

তারা একমাত্র নিজেদের কথা ভাবে না দীকু বা সাদা চামড়ার

মানুষদের মত। তাদের সব ভাবনা বস্তির সব মানুষদের জন্য। বিপদের মুখে, উৎসবে সব মানুষ এক হয়ে দাঁড়ায়। তাদের বিচ্ছিন্ন সত্তা হারিয়ে যায়। তারা দলবদ্ধ হয়ে একটা মানুষ হয়ে যায়। তখন তাদের মধ্যে অন্য আর এক রকমের শক্তি জেগে ওঠে। বনের পশু ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়। তারা একমাত্র দীকু আর সাদা চামড়ার মানুষদের আটকে রাখতে পারে নি। বরং ভয় পেয়ে বস্তির সব মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

তারা সহজেই বন্য পশুদের যাতায়াতের পথ চিনতে পারে। নাকে বিপদের গন্ধ আসে। অমনি সতর্ক হয়ে যায়। সে কতবার হাতে একখানা টাঙ্গী নিয়ে বনের মধ্যে ঢুকেছে। গাছেদের ফিস্ ফিস্ করে নিজেদের মধ্যে কথা বলা, পাতার নড়াচড়ার ভাষা শুনতে পেয়েছে। এখন সে কিছুই জানে না। ঘুমিয়ে আছে। একটা স্বপ্ন দেখছে। একটা লাল গরু নিয়ে সে মাঠের দিকে যাচ্ছে। গরুর গলায় কড়ির মালা। গরুর কানে মাছি বসছে আর লাল গরুটা মাথা নাড়ছে। অমনি কড়ির শব্দ উঠছে।

ঘুমের মধ্যে এখন সে দেখছে সাদা চামড়ার মানুষদের কুঠি। ইটের দেওয়াল দিয়ে আলাদা করে রাখা। কোন মানুষ কুঠিতে ঢুকতে পারে না। দেওয়ালের মধ্যে দরজা করা আছে। দরজা সব সময় বন্ধ থাকে। একমাত্র সাদা চামড়ার মানুষ আর তাদের অনুগতরা ভিতরে ঢুকতে পারে।

উঁচু দেওয়াল। উঁচু দেওয়ালের ওপারে বড় বড় উঁচু চাল। অনেকগুলো ঘর থাকে সাদা চামড়ার মানুষদের। একের পর এক ঘর নিয়ে অনেকগুলো ঘর। এত ঘর দিয়ে সাদা চামড়ার মানুষেরা যে কি করে তারা বুঝতে পারে না। এখন সেই সব ঘর সে স্বপ্নের মধ্যে দেখতে পাচ্ছে।

সাদা চামড়ার মানুষরা অদ্ভুত। ঘুম ভাঙ্গতেই উঠে বসলো।

অমনি দু' হাতের পাশ দিয়ে দুটো ডানা গজিয়ে উঠলো।

সাদা চামড়ার মানুষটা উড়ে একটা ঘর থেকে আর একটা ঘরে গেল। সে ঘরে গিয়ে চোখ মুখ ধুয়ে নিল। আবার উড়ে অন্য আর একটা ঘরে গেল। বসে বসে খেল গরম জল। জলের রং লালচে খয়েরি। সে জল গরম গরম খেতে হয়—ঠাণ্ডা হলেই বিস্বাদ হয়ে যায়। গরম জলের নাম চা। 'অন্য কোন এক দূরের দেশ থেকে নিয়ে আসে সাদা চামড়ার মানুষরা। ভাবতে বসলে অবাক হতে হয়। মানুষটা খাবে বেলপাহাড়ীতে বসে অথচ খাবারটা আনতে হবে অনেক দূরের একটা পাহাড় থেকে।

গরম জল খাওয়া হয়ে যেতেই সাদা চামড়ার মানুষটা আবার উড়লো। উড়ে আর একটা ঘরে গেল। সে ঘরে গিয়ে এত সময় শরীরের উপর থেকে ঝুলিয়ে রাখা ছাল চামড়াগুলো খসিয়ে ফেললো। একের পর আর একটা খুলে ঝুলিয়ে রাখলো সুতোর তৈরী চামড়া। সব খসিয়ে ফেলাতে এবার তার সাদা চামড়া স্পষ্ট হল।

আবার সাদা মানুষটা উড়লো। আর একটা ঘরে গেল। নতুন করে আবার সুতোর চামড়া পড়তে শুরু করলো। প্রথম নিচের দিকে একটা চামড়া শক্ত করে আটলো। এবার একটা চামড়ার থলের মধ্যে পা দু' খানাকে গলিয়ে দিল। চামড়া ওপর দিকে টেনে তুলতেই নিচের দিক ঢাকা পড়লো। এবার সাদা মানুষটা হাতে আর একটা চামড়া তুলে নিল। মাথা দিয়ে গলিয়ে নিচের দিকে চামড়াখানা টেনে নামালো। এবার সাদা চামড়ার মানুষটার বুক পেট ঢাকা পড়লো। আবার সে আর একটা চামড়া হাতে নিল। সে চামড়াখানাকেও মাথা গলিয়ে নামালো। এবার চামড়াগুলো গায়ের সঙ্গে শক্ত করে আঁটলো।

একের পর এক চামড়া গায়ে চাপিয়ে নিজেকে আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে আবার উড়ল। এবার সে উড়তে উড়তে আর একটা ঘরে গেল। একখানা গোল খাঁচার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। সাদা চামড়ার মানুষটা

এবার দুটো মানুষ হয়ে গেল। একটা সাদা চামড়ার মানুষের সামনে আর একটা সাদা চামড়ার মানুষ। একজন সাদা চামড়ার মানুষ অন্য সাদা চামড়ার মানুষটিকে দেখছে। দুটো মানুষ এক রকম দেখতে। সাদা চামড়ার মানুষটা গোঁফে হাত দিল অন্য মানুষটাও গোঁফে হাত দিল। একজন চুল ঠিক করলো। সামনের মানুষটাও তাই করলো।

একটা মানুষ দুটো মানুষ হয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে।

আবার সাদা মানুষটা উড়লো। আর একটা ঘরে গেল। ডানা খুলে রেখে লম্বা লম্বা পা ফেলে আর একটা ঘরে গেল। পায়ে একটা চামড়া আটকে নিল। এবার হাতে তুলে নিল একখানা ছড়ি। হাঁটতে হাঁটতে আর একখানা ঘরে গেল। সে ঘরে শনিয়ালাল দাঁড়িয়ে আছে অনুগত কুকুরের মত। সাদাচামড়ার মানুষটা শিস্ দিল।

একটা লাল গরু এসে দাঁড়ালো। সাদা চামড়ার মানুষ আর শনিয়ালাল আড়ালে চলে গেল। লাল গরুটা দুটো মানুষকে আড়াল করে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আলো ফুটলো। সে উঠে বসলো না। জঙ্গলের মধ্যে যে সে একা তা আর মনে নেই। গাছের গুঁড়ির ফোকরের মধ্যে নিজেকে ঢুকিয়ে দিয়ে ঘুমিয়েছে। একখানা পা তার ফোকরের বাইরে টান টান হয়ে আছে। এখন পায়ের কথা ভুলে আছে। ঘুম নেই, আছে ঘুমের জড়তা। আধো ঘুম আধো জাগরণের মধ্যে থেকে এখন সে ভাবছে সাদা চামড়ার মানুষদের কথা।

অদ্ভুত এই মানুষগুলো। ডানা লাগিয়ে এক ঘর থেকে আর একটা ঘরে যায়? ঘরের পর ঘর—এত ঘর তারা ব্যবহার করে কোন পদ্ধতিতে? তারা নিজেরা দু' তিন খানা ঘর নিয়ে দিব্যি জীবন চালিয়ে যাচ্ছে। এর বেশি ঘর লাগে কিসে! মানুষের থাকার জন্য একখানা দু'খানা ঘর দরকার। একখানা রান্না ঘর চাই। পাশে গোয়াল ঘর—এ সব না হলে চলে না।

গাছের পাখী, বনের পশুদেরো আশ্রয় থাকে। ইঁদুর গর্ত তৈরী করে বাস করে। শেয়াল গর্ত তৈরী করে বড় করে। তার শরীর অনেক বড়। তাই বলে একটা শেয়াল অনেকগুলো গর্ত করবে? কেন? কি লাভ একের পর এক গর্ত তৈরী করে? কিন্তু মানুষ অন্যরকম। তার চারপাশে চাই আলো হাওয়া। চাই কয়েকখানা ঘর। তাই বলে দু'কুড়ি ঘর নিয়ে একটা বাড়ি?

সাদা চামড়ার মানুষরা ঘরের পর ঘর তৈরী করে। কয়েক কুড়ি ঘর নিয়ে সাদা চামড়ার মানুষদের জীবন্। এত ঘর দিয়ে কি করে সাদা চামড়ার মানুষরা সে বুঝতে পারে না। দীকুরাও সাদা চামড়ার মানুষদের মত এখন অনেক অনেকগুলো ঘর বানায়। দীকুদের দেখে অনেক সাঁওতাল আজকাল কয়েকখানা করে ঘর তৈরী করে নিচ্ছে। দুটো মোষ থাকার পরেও আর একটা মোষ নিয়ে আসছে—সমাজের অন্যান্য মানুষদের কথা ভাবছে না।

শনিয়ালাল, দীকুদের সর্দার শনিয়ালাল। প্রথম আসে সে সমতল থেকে অন্যসব দীকুদের মত। প্রথম মাটির ঘর তৈরী করেছিল —একের পর এক ঘর মন ভরলো না। আবার ঘর তৈরী করে নিল। এবার হল পাকা ঘর—দীকুরা বলে মকাম। তারপর সাদা চামড়ার মানুষদের মত ঘর ঘিরে বড় উঁচু দেওয়াল দিল। শনিয়ালাল সবার কাছ থেকে আলাদা হয়ে গেল। দরজার সামনে বসিয়ে দিল লাঠি হাতে মানুষ। শনিয়ালাল জমিদারের মত হল। অন্য সব দীকুদের কাছ থেকে আরো দূরে সরে গেল।

সবার চোখের আড়ালে একা থাকতে থাকতে শনিয়ালাল একটা হায়না হয়ে গেল। চতুর এবং শিকারে দক্ষ। শনিয়ালাল শিকার বাড়িয়ে দিল। সাদা চামড়ার মানুষদের সঙ্গে হাত মেলালো। এবার সে জমির পর জমি দখল করতে আরম্ভ করলো। বস্তির মেয়েদের দিকে নজর দিল। গরু, মোষ, ক্ষেত খামার খেয়েও তার পেট ভরছিল না।

শনিয়ালাল ঘরের পর ঘর তৈরী করছে। জমির পর জমি খেয়ে নিচ্ছে। গরু, মোষ তাড়িয়ে নিয়ে নিজের গোয়াল ঘরে ঢুকোচ্ছে। এত গরু আর মোষ দিয়ে কি করে শনিয়ালাল ?

একটা নেকড়ে এসে দাঁড়ালো শনিয়ালালের সামনে। শনিয়ালালকে আর সে দেখতে পাচ্ছে না।

পাখীগুলো ডাকছে—একের পর এক পাখী। জঙ্গলে যে কত রকম পাখী আছে। সব পাখী এক সঙ্গে ডেকেই চলছে। সে শুনতে পাচ্ছে কিন্তু কান পাতছে না। গাছের কোটরের মধ্যে কাত হয়ে শুয়ে থেকে আপন মনে ভেবে যাচ্ছে যা যা তার মনে আসছে।

লোকটি আপন মনে ভেবেই চলছে। অরণ্য এখন চাপা আলোতে উদ্ভাষিত। সে জঙ্গলের মধ্যে বসে শনিয়ালালের গোয়াল ঘর দেখতে পাচ্ছে। এক কুড়ি মোষ আর গরু মাথা নিচু করে জাবনা খাচ্ছে। চারটে মানুষ আছে গরু-মোষগুলোকে দেখা শোনা করার জন্য। গরু-মোষগুলোকে পাহাড়ের কোলে চড়াতে নিয়ে যাচ্ছে না, খচাখচ করে বিচালী কেটে খেতে দিচ্ছে। শনিয়ালাল আবার আর এক কুড়ি মোষ নিয়ে এল। আবার আর একটা গোয়াল ঘর উঠলো। আবার আর চারটে লোক এসে কাজে লাগলো। তার ভিতর ছুটো আবার সাঁওতাল। গোয়াল ঘর অনেক লম্বা হয়ে গেল। শনিয়া-লালের বাড়ীর দেওয়াল ছুঁয়ে গেল। আর এক কুড়ি মোষ আনবে শনিয়ালাল। এবার তাদের কোথায় রাখবে ?

এবার জমির বাইরে আর একটা গোয়াল ঘর উঠবে। চবুতরার জমি শনিয়ালালের জমির পাশে। এবার শনিয়ালাল চবুতরার জমি গিলে খাবে। আর একটা গোয়াল ঘর উঠবে। তারপর ? শনি-য়ালাল আর এক কুড়ি মোষ সাঁওতালদের কাছ থেকে কেড়ে আনবে কিনা বুঝতে পারছে না।

তার মনে এল ছগণের কথা।

ছগণ থাকে নদীর ওপার। অনেকগুলো খেতের মালিক সে। নাকের নিচে ছুঁচোর লেজের মত গোঁফ। সব সময় খৈনী খেত। থেকে থেকে থুক ফেলতো আর কথা বলতো। কারোর ওপর রাগ করতো না। এড়িলিংকোড়া (শালা) বলে গালি দিলেও চটে উঠতো না। থুক করে থুথু ফেলে সাদা দাঁত দেখাতো।

একদিন বস্তির বুড়াদের মত তাকে উপদেশ দিয়েছিল। সে সামনে বসে শুনেছিল কিন্তু কিছু বুঝতে পারে নি।

ছগণ থুক ফেলে বলেছিল, তুরা সাঁনথাল আদমী বুরবাক। তুলোক ক্ষেতি বরাহাতে জানলি না। শুন, হামার বাদ শুন। আধারমে ক্ষেতির আল পুরা কাট লে, ফসল ভি লাগা দে। ব্যাস, জমি তুর বারহে গেল। তু'হাত বারতি জমিন তুহার হল।

সে সামনের ঘাসের ওপর ঘৃণার সঙ্গে থুথু ফেললো। ছগণের কথা ভুলে গেল।

সকালের ঠাণ্ডা হাওয়া গাছের নিচে থেকে হাল্কাভাবে চলে যাচ্ছে। পাখীগুলি এক গাছ থেকে উড়ে উড়ে ডানার জড়তা ভাঙছে। সে কিছু দেখছে না। চোখ এখনো খোলে নি। আপন মনে ভাবছে, একটা মানুষের কি কি প্রয়োজন। একটা মানুষের জীবনে কি কি দরকার। একটা মানুষ কতটা পরিমাণ দুধ খেতে পারে অথবা কত কাপড় জামা দরকার। মানুষের অনিবার্য প্রয়োজন, প্রয়োজনের সীমা এবং সব শেষ কি হতে পারে।

জটিল ভাবনায় বার বার খেই হারিয়ে ফেলছে। বুঝতে পারছে না একটা মানুষ মাইলের পর মাইল জমি দিয়ে কি করে। কোন কাজে মানুষ এত পরিমাণ জমি লাগতে পারে। আর টাকা। একটা রুপোর গোল চাকতি। মাঝখানে একটা ছেদা করে মেয়েরা গলায় ঝুলিয়ে দিতে পারে। দুটি সুপুষ্ট স্তনের মাঝখানে রুপোর টাকা ঝুলে থাকলে দেখতে দারুণ লাগে। বুকের স্তন দুটি যেন আরো উজ্জ্বল আর লোভনীয় হয়ে ওঠে। মানুষের চোখের কাছে

অন্য রকম সম্ভ্রম দাবী করে। তখন ঐ স্তন দুটিকে হাত দিয়ে চাপান দিতে ভয় হয়।

মেয়েরা যখন নাচে তখন করঞ্জ ফুলের মালা তাদের স্তনের সঙ্গে নিচের দিকে ঝুলে নাচে। মাঝখানে একটা রুপোর টাকা থাকলে চাঁদের আলো প্রতিফলিত করে তোলে। তখন চোখ ফেরাতে ইচ্ছে করে না।

সে ভাবছে, রুপোর গোল টাকা কোন্ কোন্ কাজে লাগতে পারে। সবাই রুপোর টাকা চায়। দীকুরা রুপোর টাকার জন্য পাগল। মহাজন আর বেনিয়ারা কয়েক কুড়ি রুপোর টাকা নিয়ে বসে আছে। তার পরেও টাকা চাইছে। সাঁওতালদের ধরছে আর বলছে, টাকা দে। টাকা না দিলে দাসখত খুলে দেখাচ্ছে। দারোগা, পুলিশ এসে বেনিয়া আর মহাজনদের পাশে দাঁড়াচ্ছে। দড়ি দিয়ে সাঁওতালদের বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে। ভয় পেয়ে তারা ক্ষেতের ফসল না খেয়ে হাটে বেচে দিয়ে টাকা নিয়ে আসছে।

হায়, হায়। এক গরুর গাড়ী গম হাত ফসকে বেড়িয়ে গেল। এখন তোমার ফলানো গম মহাজনের ঘরে। তুমি কি পেলে? কয়েকটি রুপোর গোল চাকতি। চাকতিগুলো তোমার কোমরে ঝন্ ঝন করে বাজছে। তোমার কাছে সে থাকতে চাইছে না। মহাজন আর সাদা চামড়ার মানুষদের কানুন অদৃশ্য হাতে তোমার কাছ থেকে কেড়ে নেবে।

কানুন জারি হয়েছে প্রতি হালের জন্য আলাদা খাজনা দিতে হবে। ফসল দিয়ে আর খাজনা দেওয়া যাবে না, রুপোর টাকায় দিতে হবে।

সাদা চামড়ার মানুষরা চায় টাকা। দীকুরা চায় টাকা। সে বিড় বিড় করে বললো, মানুষ কি পাগল হয়ে গেল?

সাদা চামড়ার মানুষটা সুধরের কাঁধের নিচে ধাঁ করে একটা ঘুষি

হাঁকড়ে দিল। সুধরের কোন অপরাধ ছিল না। এক নাগারে কাজ করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। একটু বিশ্রাম নিলে আবার শক্তি ফিরে পাবে। সে মাটির ওপর উপুড় হয়ে বসে হাত-পাগুলো আবার সহজ করে তুলতে চেয়েছিল।

সাদা চামড়ার মানুষটার সহ্য হল না। মানুষগুলো শুয়োরের মত যে কখন ক্ষেপে যাবে তাই বোঝা যায় না। সাদা চামড়ার মানুষটা তীর বেঁধা শুয়োরের মত ধেয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো, ঘুষি চালিয়ে দিল কাঁধের নিচে।

সঙ্গে সঙ্গে সাদা চামড়ার মানুষটা মাটিতে বসে পড়লো। ক্রোধে লাল মুখখানা এবার হাতের যন্ত্রণায় নীল হয়ে যাচ্ছে। তা হলে সাদা চামড়ার মানুষদের হাতেও চোট লাগে! চোট লাগলে মাথা ঝন্ ঝন্ করে ওঠে। লাল মুখ নীল হয়ে যায়।

সাদা চামড়ার মানুষটার হাতে খুব জোরে লেগেছিল। ঘুষি পড়েছিল পিঠের হাড়ের ওপর। সুধর তেমন কোন ব্যথা পায় নি। সাদা চামড়ার মানুষটা এবার আরো ক্ষেপে গেল। খিস্তি দিল। তারপর যা করলো তাতে সুধর বিস্ময়ে থ মেরে গেল। সাদা চামড়ার মানুষটা হাতের পাঞ্জা থেকে ফস্ করে হাতের পাঞ্জা খসিয়ে নিল। পাঁচ পাঁচটা আঙ্গুল সমেত হাতের পাঞ্জা খসিয়ে নিল। পাঁচ পাঁচটা আঙ্গুল সমেত হাতের পাঞ্জা খুলে নিয়ে বাঁ হাতে রাখলো। মুঠোয় ডান হাতের পাঞ্জাটা ঝুলিয়ে নিয়ে গট্‌মট্ করে ইঁদারার কাছে গেল। সাদা চামড়ার মানুষটা বাঁ হাত থেকে ঝুলছে আরো পাঁচটা আঙ্গুল! অথচ ডান হাতের আঙ্গুল যেমন ছিল তেমনি আছে। একটাও কমেনি বরং পাঁচটা আঙ্গুল এখন তার বেশি।

ইঁদারার জলে ডান হাতের আঙ্গুলগুলো ভেজালো। মুখ তখন আর নীল নেই। লাল মুখ আবার টুকে টুকে লাল হয়ে উঠেছে। ডান হাতে আবার বা হাতের পাঞ্জা নিল। হাতের মধ্যে আবার হাত পুরে ফেললো।

সুধরের বলা গল্প তারা ভুলতে পারবে না। সাদা মানুষদের হাতের পাঞ্জার ওপর আরো একখানা পাঞ্জা থাকে। চামড়া অথবা অন্য কিছু দিয়ে তৈরী। ভয়ানক গরম। পাঞ্জার ওপর আর একটা পাঞ্জার খোলস কোন্ কাজে লাগে?

মানুষটি ফোঁকরের মধ্যে বসে আপন মনে ভাবছে—এত কাজের তাড়া কিসের জন্য! তারা কাজ করে। তার বুড়ো বাপ বসে থাকতো না। ফসল কেটে দিত। সে নিজে ফসল কাটতো আবার মাথায় তুলে বস্তিতে নিয়ে আসতো। ঝাড়াই মড়াই করতে হয়। এ সব কি কাজ নয়? মানুষকে কাজ করতে হয়! তাদের কাজের আরম্ভ আর শেষটা তারা নিজেরাই টের পায় না। কাজ শেষ হয়ে গেল ব্যাস। চল এবার একটু হাড়িয়া খেয়ে নিয়ে—

সাদা চামড়ার মানুষগুলো অন্যরকম। হাতে একটা চাবুক নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে আর হুকুম করে। অদ্ভুত খঠমটে এক ভাষায় কথা বলে। অথচ নিজেরা কাজ করে না। একটা কাঠের কাঠি মুখে গুঁজে শুধু ধোঁয়া খায়।

একটা ধনেশ পাখী উড়ে এসে বসলো তার মাথার ওপর গলা ছেড়ে ডেকে উঠলো। এবার তার ঘুমের জড়তা কাটলো। চোখ দুটি প্রথম রগড়ে নিল। এবার ভোরের জঙ্গল তার চোখে প্রতিবিম্বিত হল। প্রথম সে অবাক হল। হ্যাঁ, সে বেঁচে আছে—এই বেঁচে থাকতে পারা সব থেকে অদ্ভুত।

এবার সে তার পায়ের পানে তাকালো। লম্বা করে শুইয়ে রাখা পাখানা ফুলে উঠেছে। তাই বলে পা নিয়ে ভাবতে বসলো না। পা থাকলে সে পায়ে চোট লাগতে পারে। চোট লাগলে পা ফুলে উঠবে বা অন্য কিছু এমন তো হতে পারেই। সব থেকে ভাবনা পুরো শরীরটাকে বাঁচিয়ে রাখা। জঙ্গলের মধ্যে সব থেকে কঠিন কাজ।

তার ভাবনা অন্য দিকে ঘুরে গেল। বস্তি কি আর নিরাপদ আছে? সে আপন মনে মাথা নাড়লো। জঙ্গলের জানোয়ার

কখনো কখনো বস্তিতে হানা দেয়। রাস্তা বেয়ে পাহাড়ে উঠে আসে দীকু আর সাদা চামড়ার মানুষরা। তাদের মধ্যে অনেক হায়না থাকে। হায়না চতুর এবং দক্ষ শিকারী। তাদের দাঁতে আছে কাস্তের ধার। চোয়ালের চাপে হাড় পর্যন্ত কেটে ফেলতে পারে। বস্তির মানুষেরা এখন আর হায়না মেরে ফেলার কথা ভাবতেও পারে না। ভয়ে নিজেরা নিজের ভিতর সিটিয়ে যায়। সে একটা জানোয়ার শিকার করেছে। তার মনে আনন্দ ঝলকে উঠলো। মনের খুশিতে শিস দিল।

একটা ময়ূর উড়ে বেড়িয়ে গেল। ময়ূরের পিছনে পিছনে এল কতগুলো টিয়ে পাখী। তার চোখে আলো জ্বলে উঠলো। কাছাকাছি কোন গাছে ফল আছে।

এবার তার খাবার কথা মনে এল। পেট একেবারে ফাঁকা। সে একটা ফলবান গাছ পাবার আশায় ফোলা পা নিয়ে যাত্রা করলো।

তার চারপাশে বড় বড় গাছ। গাছের পাশে আর একটা গাছ। সে ভাবলো গাছগুলো সব ভাইয়ের মত। পর পর তারা দাঁড়িয়ে আছে। গাছের ডাল যদি হাত হয় তবে তারা হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছে। সূর্যের আলো আড়াল করে রেখেছে। আলো আড়াল করে রেখেছে বলে তার ভিতরের মানুষটা বাইরে বেরিয়ে আসতে পারছে না। যদি সে পাশে থাকতো তবে একজন সঙ্গী হত। সঙ্গীহীন এই একক জীবনে কখনো কখনো ভয় এসে সামনে দাঁড়াচ্ছে। জঙ্গলে বেঁচে থাকা যায় কিনা—এ প্রশ্ন মনে জাগছে। তখন তার মানুষের মধ্যে ফিরে যাবার ইচ্ছে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ছে যে আর তা সম্ভব নয়। সে এখন গভীর বনের মধ্যে। কোন দিকে বস্তি আছে জানা নেই। এখন চারদিক তার কাছে সমান অন্ধকার।

সে হতাশায় ভেঙ্গে পড়েছে তা নয়। হতাশা আর নৈরাশ্যের

সঙ্গে সে পরিচিত নয়। বাঁচার জন্য তাকে চেষ্টা করতে হবে—এমনি করে মানুষ বাঁচে। এ রকম এক পদ্ধতিতে তাদের পূর্ব-পুরুষরা বেঁচেছিল।

সাদা চামড়ার মানুষরা প্রতিনিয়ত এই বাঁচার চেষ্টার রূপ কি জানে না। ঘোড়ায় চেপে এক পাহাড় থেকে আর এক পাহাড়ে যায়। পিঠে থাকে বন্দুক হাতে আছে চাবুক। তারা দু'হাতে শুধু চায়। তার জন্য তারা রাস্তা তৈরী করে। রাস্তা তৈরী হয়ে গেলে তাদের চাহিদা আরো বাড়ে। তারপর শুরু হয় দু'হাতে নেওয়া। তুমি যত দেবে তত নেবে—তাদের ক্ষেতের ফসল পর্যন্ত বাদ যায় না।

তার পা হড়কে গেল। একটা পিচ্ছিল পাথরের উপর পা পড়েছে। হাতে লগুড় ছিল বলে সহজেই নিজেকে সামলে নিতে পারলো। কিন্তু যাচ্ছে সে কোথায়? কেনই বা হাঁটবে? এক জঙ্গল থেকে আর একটা জঙ্গলে চলে যেতে পারবে। হাঁটতে থাকলে এক জঙ্গল থেকে আর এক জঙ্গলে যাওয়া যায়। একের পর এক জঙ্গল পাড়ি দেবেই বা কেন? সে কি সাদা চামড়ার মানুষদের মত হয়ে যাচ্ছে?

কত দূর দূরান্তের দেশ থেকে সাদা চামড়ার মানুষরা এই কালো মানুষের দেশে এসেছে। এত পথ পাড়ি দেবার কি দরকার ছিল? সাদা চামড়ার মানুষদের দেশে ফসল ফলাবার মত ক্ষেত নেই? তাই তারা সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এত দূরে চলে এসেছে? প্রথম বসতি পাতলো সমতলে। কিন্তু তাদের মন ভরলো না। পায়ে পায়ে উঠে এল পাহাড়ে। পাহাড়ে উঠে বলছে, টাকা দে, ক্ষেতের ফসল দে।

একের পর এক প্রশ্ন তার মাথায় আসছে। গাঁও প্রধানরা এসব প্রশ্নের কোন জবাব দিতে পারে না। তারা অনেক কিছু জানে, জানেনা শুধু সাদা চামড়ার মানুষদের দেশ কোথায়। কেন তারা এত দূর দেশ থেকে এদেশে এল!

এখন সে প্রশ্নের জবাব খুঁজে পেয়েছে। তার ভিতর থেকে প্রশ্নের জবাব এসে গেল—সাদা চামড়ার মানুষরা এসেছে টাকার জন্য। রুপোর চক্ চকে টাকা আকাশের চাঁদের মত। ঠুন্ ঠুন্ করে শব্দ হয়। একজন যখন আর এক জনের কাছ থেকে হাত পেতে নেয় তখন টোকা দিয়ে বাজিয়ে নেয়। ঠুন্ ঠুন্ করে মিষ্টি আওয়াজ হয়।

শব্দের মধ্যে এক রকমের নেশা আছে। সাদা চামড়ার মানুষ আর দীকুরা সেই শব্দের নেশায় পাগল। দীকুরা পাহাড়ের মানুষদের মত ভাত, রুটি খায়। সাদা চামড়ার মানুষরা খায় মাংস আর রুপোর টাকা। তারা যেমন মকাই সিদ্ধ করে খায় সেই রকম। থালার মধ্যে টাকাগুলো রেখে মাংস নিয়ে বসে বসে খায়। একটার পর একটা টাকা তুলে মুখের মধ্যে পুরে দেয়। তারা যেমন মকাইয়ের খৈ চিবিয়ে খায় তেমনি করে চিবিয়ে চিবিয়ে খায়। নয়তো এত টাকা কোন্ কাজে লাগে সাদা চামড়ার মানুষদের? তাদের বস্তিতে যারা থাকে তাদের তো দরকার হয় না! মুরগী, ছাগল, গরু, মোষ আর চষার জমি হলেই তাদের চলে যায়। বস্তির কাছে কয়েকটা মহুয়া গাছ থাকা দরকার। তাদের জানতে হয় কি ভাবে হাড়িয়া তৈরী করতে হয়। হাড়িয়া তাদের চাই। হাড়িয়া না থাকলে কোন উৎসব জমে নাকি?

তাদের গায়ের রং কালো। তারা যদি টাকা খেত তবে তাদের গায়ের রং সাদা চামড়ার মানুষদের মত হত। তাতে বাড়তি কোন সুখ থাকে কিনা জানা নেই।

একটা শঙ্খচূড় সাপ মাথা তুলে দাঁড়ালো। বিশাল তার ফণা। বুকের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে পাথরের মত দাঁড়িয়ে আছে, নড়লেই শঙ্খচূড় ছোবল হানবে।

হাতে তার লগুড় আছে। ঠিক মত মারতে পারলে সাপ থেতলে যাবে। কিন্তু লগুড় উপরে তোলা অসম্ভব। লগুড় নড়লে তার

শরীর নড়বে। সে লগুড় ব্যবহার করার সুযোগ পাচ্ছে না। দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে।

শঙ্খচূড় সাপ মুহূর্তে ফণা নামিয়ে নিল। তারপর আবার ঘাসের মধ্য দিয়ে চলতে শুরু করলো। সে নিজেকে নিজে গালি দিল। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে এমন উদাসীন ভাবে চলতে থাকা ঠিক হয়নি। জঙ্গলের নিয়ম জঙ্গলে বসে মানতে হয়। এসব সে জানে, জেনেও ভুল করছে। নিয়ম মেনে চললে সে শঙ্খচূড়ের আস্তানা চিনতে পারতো। এই ভুল সে ঐ বিশাল গাছটার ওঠার সময় করেছিল। একটা মরা গাছ বেছে নিল। মরা গাঁছে অনেক ফাটল আর ফোঁকর থাকে কে না জানে! ফোঁকরে সাপ আস্তানা নেবে। সবারই একটা আশ্রয় দরকার। আর সেখানে অন্য আর একজন এলে সে তো রেগে যাবেই। সে ভুল করেছিল। তাই এখন একটা পা ফুলিয়ে তাকে টেনে টেনে চলতে হচ্ছে।

জঙ্গল পাতলা হয়ে গেল। সে দাঁড়িয়ে আছে চড়াইয়ের মাথায়। নিচে সমতল জমি। উতরাই এখানে টাল খেয়ে নেমে গেছে নিচের দিকে.

আকাশে এখন উজ্জ্বল রোদ। বিশাল সমতল ভূমি রোদের নিচে চিত হয়ে শুয়ে আছে। ঘাস গজিয়ে সমতল ভূমি সবুজ। মাঝে মাঝে লাল মাটি। দূরের দিকে চোখ চলে যেতে সে বিস্মিত হয়ে গেল। সমতল ভূমির এক পাশে একটা পাহাড় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। পাহাড় তেমন উঁচু নয়। সে চোখ দিয়ে একবার পাহাড়ের উচ্চতা জরিপ করে নিল। ক' কুড়ি মানুষ লাগবে পাহাড়ের উঁচু মাথা ছুঁতে? কয়েক কুড়ি মানুষ লাগতে পারে।

মন খুসিতে তার ভরে গেল। এবার একটু স্বস্তি নিয়ে বসতে পারবে। পাহাড়ের ওপরে আছে নিরাপদ আশ্রয়। তার তিন দিকে আছে সমতল ভূমি। পেছন দিকে খাড়া হয়ে থাকা পাহাড়। সমতল থেকে কোন জানোয়ার এলে অনেক দূর থেকে দেখতে পাবে।

হঠাৎ পেছন থেকে এসে জানোয়ার ঝাঁপিয়ে পড়ে টুটি চেপে ধরতে পারবে না।

পা টানতে টানতে সে নিচের দিকে নামতে শুরু করলো। ফোলা পাখানা তাকে নানা অসুবিধার মধ্যে ফেলছে। পা ক্রমশ ফুলে মোটা হয়ে উঠছে, আর ওজন বাড়ছে। অবশ্য ফোলা পায়ের কথা সে ভাবছে না। তার ভাবনা চিন্তা এখন অন্যদিকে চলে যাচ্ছে—বাঁচার কথা বড় বেশি করে মনে হচ্ছে।

তার পক্ষে আর দৌড়ন সম্ভব নয়। গাছে উঠতে পারবে না। দু'দিন দু'রাত কেটে গেল গভীর জঙ্গলের মধ্যে। সহায় সম্বলহীন হয়েও এখনো বেঁচে আছে। জঙ্গলে কখনই সে নিরাপদ নয়। জঙ্গল সব সময় ভয়ঙ্কর। সেই ভয়ঙ্কর জঙ্গলে এখন তাকে থাকতে হবে। মরার কথা আর ভাবতে পারছে না। মরবেই বা কেন? সে তার কাজ করেছে যা করার। পরাজিত মানুষের মত ভয় পেয়ে পিছিয়ে যায় নি। সে বস্তির মরদদের মত কুত্তা বনে যায় নি। একটা মরদ এক শোনচিড়িয়াকে খুন করেছে। মরদ তো তাই করে।

মারতে যাবার সময় সে নিজের মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়েই গিয়েছিল। শনিয়ালালের মত খতনার শোনচিড়িয়া খতম করা কঠিন তা জানতো। জানতো বলে মারবে অথবা মরবে—দুটো পরিণতির যে কোন একটার জন্য প্রস্তুত হয়ে শিকারে নেমেছিল।

খানিকটা পথ নেমে আসতেই সে নিজের ভিতরকার মানুষটাকে আবার দেখতে পেল। তার সামনে ঘাসের উপর চিত হয়ে শুয়ে আছে। তার সামনে তার ভিতরের মানুষটা সমতলের দিকে নামছে। পিছনে সূর্য তার সামনে তার ছায়া, তার ভিতরকার মানুষ। সে আবার বাইরে বেরিয়ে এসেছে। চান্দোবোঙা সবসময় ভিতরের মানুষটাকে বাইরে আসতে দেয় না।

সে তার ছায়ার পানে তাকিয়ে বললো, আমি একটা মরদের মত এখানে বেঁচে থাকবো। তুই শুনে রাখ আমার কথা, আমি বেঁচে

থাকবো। বলার কথা শেষ করে বুক ভরে বাতাস টেনে নিল। তার আত্মবিশ্বাস আবার ফিরে এসেছে।

সে হাঁটতে হাঁটতে এসে দাঁড়ালো একটা বহেড়া গাছের ছায়ায়। তাকিয়ে রইল দূরের ঘন জঙ্গলের দিকে।

সে দাঁড়িয়ে আছে একটা গাছের নিচে। সারা গায়ে তার গাছের ছায়া। এখন জঙ্গলকে আর ভয়ঙ্কর বলে মনে হচ্ছে না, বরং ভালো লাগছে। গাছের আঁকাবাঁকা ডাল ভারী সুন্দর। গাছের নিচের ছায়া নকশা বোনা চাটাইয়ের মত। হাওয়া এসে নকশা বার বার বদলে দেয়। গাছগুলির একটার ছায়া আর একটার কাছে চলে আসে। কানে কানে কথা বলে। আবার দূরে সরে যায়।

অরণ্য বড় সুন্দর, ফুল ফল নিয়ে এক রকমের গভীর নির্জনতা নিয়ে অপেক্ষা করে। পাখীরা সেই নিরবতার মধ্যে কখনো কখনো গান গেয়ে ওঠে। কত রকমের পোকা উড়ে বেড়ায় গাছের পাতায়। মৌমাছি ভন্ ভন্ করে ঐক্যতান গড়ে তোলে। কি দরকার তার বস্তিতে ফিরে যাবার? সাদা চামড়ার মানুষদের দাস হবার কোন আগ্রহ তার নেই।

উপত্যকার পথে নামতে থাকলো সে। একটা গানের কথা মনে এল। "আম দ সাহেব গুতি, ইঞ দ রেঙ্গেচ হপন চেকা লেকা তেম আসুলইঞা?" তুমি বড়লোক সাহেব বাড়ির চাকর, আমি গরিব মেয়ে—সে ঘৃণার সঙ্গে থুথু ফেললো।

হাঁটতে হাঁটতে এসে পাহাড়ের নিচে দাঁড়ালো। পাহাড় খাড়া যেন মাটি ফুঁড়ে উঠেছে। চারপাশ থেকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে অন্য পাহাড়। চারদিক থেকে মাথা উঁচু করে সমতলের ছোট পাহাড়টিকে তারা আড়াল করে রেখেছে।

আবার সে ভেতরের মানুষটাকে দেখতে পেল। তার পাশে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে হাতে একটা লগুড় নিয়ে। এবার সে পাহাড়ের

ছায়ার মধ্যে যাবে। অমনি ভেতরের মানুষটা আবার হারিয়ে যাবে। সে বিড় বিড় করে বললো, এই মরদটা আমার সঙ্গে থাকবি। তুই সঙ্গে থাকলে আমি ভয় পাবো না। সে সমতল মাঠের দিকে তাকালো।

পাহাড়ের ওপরে ওঠার মত একটা পথ পেল। পাহাড়ের মাথায় একটা জাম গাছ। জাম এখন থাকার কথা নয়।

খানিকটা ওপরে উঠে এবার দেখতে পেল জল। পাহাড়ের ডান দিকে মাঠের শেষে একটা খাদ। খাদের মধ্যে নীল জল টল টল করছে। তার চোখ এখন উজ্জ্বল। জল মানেই জীবন। সেই জীবন এখন নাগালের মধ্যে। জঙ্গলের প্রাণীরা প্রাণ রাখতে জল খেতে আসে। তার হাতের নাগালের মধ্যে এখন জল আর প্রচুর শিকার।

সে আরো ওপরে উঠলো। পথে বড় বড় মসৃণ কালো পাথরের চাঁই। একটার পর একটা তাকে পার হয়ে উঠতে হচ্ছে। ফোলা পাখানা তাকে এবার বেগ দিচ্ছে। ওপরে তুলতে গেলেই মাথার মধ্যে ঝন্ ঝন্ করে উঠছে। এই বিরক্তিকর ফোলা পাটা যদি তার সঙ্গে না থাকতো সে ভাবলো। বিড় বিড় করে বললো, আমার পা শালা, এখন আর আমার নয়।

একটা ময়ূর ডেকে উঠলো কোঁ-কোঁ-কোঁ। বিচিত্র গলায় ডেকে উঠে নিচের দিকে নেমে গেল। মানুষ দেখতে পেয়ে ভয় পেয়েছে। হাতে আবার একখানা লগুড়। ভয় পাবার কথা। হয়তো সে মানুষ দেখলো এই প্রথম।

· মাথার ওপর হঠাৎ ময়ূরের চীৎকারে সে চমকে উঠলো। একখানা পাথর ধরে অনিবার্য পতন থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারলো। তখন দেখতে পেল গুহার মুখ। তার মাথার ঠিক ওপরে একটা গুহার মুখ তার জন্য অপেক্ষা করছে। আর একখানা পাথর টপকাতে পারলে সে গুহার মুখে পৌঁছে যেতে পারবে।

গুহার মুখে উঠে সে লগুড় হাতে এবার সোজা হয়ে দাঁড়ালো। গুহার মুখ এত বড় যে সে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে। তার পিছনে পাথর টাল খেয়ে নিচের দিকে নামতে শুরু করেছে। সে খুশি হয়ে মাথা নাড়লো। গুহার মুখ একখানা ঘরের মত। খাবার সংগ্রহ করতে পারলে নিরাপদে বাস করা যেতে পারে।

আবিষ্কৃত গুহা তার মনে ভরসা আর প্রশান্তি এনে দিয়েছে। সে গুহাটিকে লক্ষ্য করতে লাগলো। আপন মনে ভাবতে থাকলো নানা রকমের কথা। মানুষের জন্ম আর মৃত্যুর মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। মানুষ, পশু, পাখী সবাইকে মরতে হয়। মরার আগের দিনগুলি হল বাঁচার। তুমি কি ভাবে বাঁচবে তা তোমাকেই ঠিক করে নিতে হবে। তোমাকে ঠিক করতে হবে তুমি মরদের মত বাঁচবে কিনা।

তাদের বস্তির মানুষেরা এখন মরদের মত বেঁচে থাকার কথা ভুলে গেছে। নয়তো দীকু আর সাদা চামড়ার মানুষদের কাছে যায় কাজ করতে।

দীকু:দর মধ্যে অনেক ভালো মানুষ আছে। তারা তাদের মত চাষবাস নিয়ে থাকে। সর্বনাশা শয়তান হল ঐ বেনিয়া, সুদখোর মহাজন আর সাদা চামড়ার মানুষরা। অনেক সাঁওতাল যায় ঐ সব বেনিয়া, সুদখোর আর সাদা চামড়ার মানুষদের কাজ করতে। তাতে তারা সুখ পায়। হাতে টাকা আসে। টাকা থাকলে না কি সব কিছু পাওয়া যায়। সত্যি পাওয়া যায়? হয়তো কোন সুখ আছে রুপোর গোল চাকতির সঙ্গে। তাই সাদা চামড়ার মানুষ আর দীকুরা টাকা পাবার জন্য পাগল। সাদা চামড়ার মানুষরা তাদের দেশ থেকে এসব টাকা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। তাতো আনতেই পারে। তবে সাদা চামড়ার মানুষরা যা নিজেরা তৈরী করতে পারে তার জন্য এমন মরিয়া হয় কেন?

তার কাছে সবটা অদ্ভুত বলে মনে হচ্ছে। যারা টাকা তৈরী

করে তারা কেন টাকার জন্য পাগল গাঁও বুড়োরা জানে না। তার ভিতরের মানুষটা বাইরে থাকলে তাকে জিজ্ঞেস করতে পারতো। ভিতরের মানুষটা এখন তার আসে পাশে নেই।

সে গুহার মুখে বসে আপন মনে ভাবছে কত রকম ভাবনা মাথায় আসছে যা আগে কখনো আসেনি। ঘুরে ঘুরে তার মনে বার বার টাকার কথা আসছে।

তারা কালো মানুষরা পাহাড়ে থাকে। তাদের কি দরকার টাকার? টাকা দিয়ে কি পেতে পারে বুঝতে পারে না সে। মাঠের ফসল দিয়ে যদি সমতলের মানুষেরা নুন আর কাপড় দেয় তবে আর কি দরকার। একটা মানুষের ক'হাত কাপড় চাই? তার কোমরে পাঁচ হাত লম্বা একখানা কাপড় ছিল, ফেলে দিয়েছে। এই জঙ্গলে এক ফালি কাপড় তার কোন কাজে লাগবে না। বস্তিতে থাকলে লাগতো। পাঁচ হাত কাপড়েই মিটে যেত। জানুসন্ধিতে লাল ঠোঁটের, কালো পাখীটাকে বেঁধে আটকে রাখতে পারলেই হল। তার বেশির কি দরকার। সাদা চামড়ার মানুষরা কত বেশি কাপড় ব্যবহার করে। দরকার নেই এমন কতগুলো কাপড় আমি টেনে বেড়াচ্ছি। কি অদ্ভুত এই সব মানুষরা।

এবার সে তার পায়ের দিকে মন দিল। ফোলা পাখানাকে লম্বা করে দিল। পায়ের উপর হাত বুলিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিল, বললো, তোর খুব কষ্ট হচ্ছে, না? তা আর কি করবি বল। অত জোরে চোট লাগলে কষ্টতো পেতেই হবে।

পাখীর ডাক ভেসে আসছে। পাখীরা বেশ আছে সে ভাবলো। সারা দিন ঘুরে ঘুরে ফল খায়। অন্ধকার হলে ডানা গুটিয়ে ঘুমায়। মানুষ যদি পাখীর মত জীবন পেত? তখন তার বাজ পাখীর কথা মনে এল। বাজ পাখী বড় পাখী। বড় পাখী বলে ছোট পাখী শিকার করে। সাদা চামড়ার মানুষেরা বাজ পাখীর মত। অত দূর দেশ থেকে এসে একটার পর একটা পাহাড় গিলে খেয়ে নিল।

তারা এতগুলো মানুষ পাহাড়ে থাকে অথচ একটা পাহাড়ও বাঁচাতে পারলো না।

ধলভূম, মানভূম, সিংভূম, সাঁওতাল পরগণার পাহাড়গুলো সব একটার পর একটা গিলে খেয়ে নিল। তারপর রুপোর টাকা ছড়িয়ে দিল। তাদের সমাজে এসে টাকা চেপে বসলো। সমাজ ভেঙ্গে গেল। এখন একজনের বিপদ আর সবার বিপদ নয়। যে যেমন পার নিজেকে সামলাও। এই যেমন তার পা খানা, ফুলে ওঠা পা খানা তার। এখন পা খানাকে তার নিজেকেই বাঁচাতে হবে অথবা ঝেড়ে ফেলতে হবে। সমাজ এখন এইখানে। সবার পা মিলে একটা পা হয় না। সবার হাত এক সঙ্গে চলে না।

এখন সে গুহার মুখের সামনে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে। পায়ের কথা মনে নেই। থেকে থেকে তার চোখ চলে যাচ্ছে নিচের উপত্যকায়। উপত্যকা গায়ে সবুজ রং মেখে ধাপে ধাপে ওপর দিকে উঠে গেছে। সবার লক্ষ্যে নীল আকাশ।

সবুজ উপত্যকায় পড়ন্ত বেলার রোদ। একটা তিতির সবুজ উপত্যকা থেকে উড়ে এসে গুহার মুখে বসলো। একটা মানুষ দেখতে পেয়ে অবাক চোখে তাকিয়ে আছে। ছোট চোখ দুটি বার বার ঘুরে যাচ্ছে—চিনতে পারছে না বলে অবাক হচ্ছে।

এবার সে কথা বললো, এই যে ছোট পাখী। সে কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তিতির ধাঁ করে নিচের দিকে উড়ে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেল।

এবার সে নিজেকে অসহায় মনে করলো। তীর ধনুক সঙ্গে থাকলে তিতির পালিয়ে যেতে পারতো না। সে কথা বলে নিজের অস্তিত্ব জানিয়ে দিত না। তিতির পাখী তারা অনেক সময় শিকার করেছে।

সে এবার উঠে বসলো। মনে এল তিতির শিকারের স্মৃতি।

যখন শিকারে যায় তারা দল বেঁধে যায়। তারা দল বেঁধে কাজ করে, নাচে, গান গায়। একা একা গান করা, কাজ করা, শিকার করতে জানতো না। সাদা চামড়ার মানুষরা দল বেঁধে কোন কাজ করে না। তাদের কাছ থেকে একা একা কাজ করা, শিকার করতে যাবার শিক্ষা এসেছে। এ সব কথা মনে আসাতে আবার তার বুক ঠেলে ঘৃণা উঠে এল। থুথু ফেললো গুহার মুখে।

থুথু ফেলতেই আবার শনিয়ালালের কথা মনে এল। শনিয়ালাল চিৎ হয়ে রাস্তার মাঝখানে পড়ে আছে। গলার মাঝখানে একখানা টাঙ্গী গেঁথে আছে। তার চোখ খোলা শনিয়ালাল আকাশ দেখছে।

পর পর তিনটে খুন হয়ে গেল বলে মনে কোন আপশোষ নেই।

তার মনে আসছে সাদা চামড়ার মানুষদের কথা। তারা শিকারী কুকুরের মত তাকে খুঁজবে। অথচ তারা নিজেরা খুন করে। প্রয়োজনে বন্দুক তুলে কালো মানুষদের কাটা শাল গাছের মত ফেলে দেয়। তাই বলে কালো মানুষরা বিচার করবে? সাদা চামড়ার মানুষরা তা হতে দেবে না। তোমাকে তারা খুঁজে বের করবে। প্রয়োজনে তারা ইঁদুর পর্যন্ত হতে পারে। তোমার লুকিয়ে থাকা গর্তে ঢুকে তোমার টুটি চেপে ধরে ওপরে তুলে আনবে। তোমাকে ধরে এনে টুটুর মত দুটো হাত কেটে দেবে। তোমাকে কুকুরের মত হাঁটু ভেঙ্গে মাথা নিচু করে চেটে চেটে খেতে হবে। তাম্রজুরি থেকে চারজন সাঁওতাল ধরে নিয়ে গিয়ে সাদা চামড়ার মানুষরা গুলি করেছে। মরজুকে এমন চাবুক মেরেছে যে তার মুখ আর চেনা যায় না। একটা চোখ দিয়ে তাকে পৃথিবী দেখতে হয়। সাদা চামড়ার মানুষরা কি ভয়ঙ্কর। তাকে যদি একবার হাতের মুঠোয় পায়—এসব কথা আর ভাবতে চাইছে না। তবু মনে এসে যায়।

জঙ্গলের মধ্যে এই পলাতক জীবন এখন বেঁচে থাকতে পারার একমাত্র উপায়। কিন্তু একক নিঃসঙ্গ জীবন সুখের বলে মনে হচ্ছে না। স্বস্তি পাচ্ছে না। অজানা এক ভয় তার বুকের মধ্য থেকে

মাঝে মাঝে জেগে উঠছে। চারদিকের নীরবতা আর প্রান্তর বুকের ওপর চেপে বসে আছে। একটু একটু করে তার বুকের সাহস চেটে চেটে খেয়ে নিচ্ছে। বার বার শনিয়ালাল আর সাদা চামড়ার মানুষদের কথা মনে আসছে।

কেন এই অস্বস্তি, সে নিজেকে নিজে প্রশ্ন করে। কোন উত্তর পায় না। একা বসে আছে পাহাড়ের গুহায়। নিচে অনেক পাথর। ছোট ছোট টিলা পাথর পাহাড়ের নিচে ছড়িয়ে আছে। সাদা চামড়ার মানুষরা এরকম পাথর কুড়িয়ে সংগ্রহ করে। এর জন্য তারা অনেক মানুষকে লাগিয়ে দিয়েছে। মানুষগুলো সারাদিন ঘুরে ঘুরে পাথর সংগ্রহ করে। সন্ধ্যা হলে সাদা চামড়ার মানুষদের কুঠিতে দিয়ে আসে। সাদা মানুষরা পাথর পেলে টাকা দেয়।

আবার সে নিচের দিকে তাকালো তিতিরটাকে দেখতে পেল না। এখন আকাশ নীলে নীল। সূর্য পাহাড়ের মাথার কাছে। আবার সে নিজের পা দেখলো। ফোলা পাখানা তাকে ভয় দেখাচ্ছে। পায়ের গাঁট ভয়ানক ফুলে উঠেছে। মালাইচাকি চামড়া ছিড়ে বেরিয়ে যেতে চাইছে। বস্তি হলে ওঝার কাছে চলে যেত। ওঝা পাতা বেটে লাগিয়ে দিত। গরম সেক দিলে তার পা আবার তার হয়ে উঠত।

গরম সেক দিতে আগুন চাই। আগুনের কথা মনে আসতেই সে দপ্ করে নিভে গেল।

গভীর রাত্রে ঘুম ভাঙ্গলো তার। আকাশ পরিষ্কার। বিশাল চাঁদ পাহাড়ের মাথার ওপর জ্বল জ্বল করে জ্বলছে। এ রকম চাঁদ উঠলে তারা মাদল বাজায়। মেয়েরা ছুটে আসে ঘর থেকে। আসার সময় করোঞ্জা তেল মুখে মাখে। খোঁপায় গুঁজে দেয় লাল ফুল। শুরু হয় নাচ। তারাও নাচে।

মেয়েরা একে অপরের কোমরে হাত রেখে দাঁড়ায়। তারা

ছেলেরা হাত ধরাধরি করে দাঁড়ায় মুখোমুখি। মাদল বাজে ধিতাং ধিতাং ধিতাং। শুরু হয় নাচ—এ সব যেন অনেক দূরের স্মৃতি।

তাদের নাচিয়ে তোলে যে চাঁদ সেই চাঁদ এখন আকাশে। চাঁদের আলো উপত্যকার ওপর শুয়ে আছে স্বপ্নের মত। উপত্যকা এখন রহস্যময়। চাঁদের খানিকটা আলো তীর্যক ভঙ্গীতে এলিয়ে পড়েছে গুহার মুখে।

সে আবার চোখ বুজলো, ঘুম এলনা। বিচিত্র এক রকমের অস্বস্তি তার চেতনায় কাজ করছে। গুহার মধ্যে যেন কোন এক অজ্ঞাত বিপদ ওৎ পেতে বসে আছে। চোখ বন্ধ করলে অস্বস্তি বাড়ছে। গুহার ভিতরের অন্ধকার ভল্লুকের থাবার মত হিংস্র হয়ে বুকের উপর চেপে বসে আছে। অন্ধকারের গা থেকে উষ্ণতা গুহার মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছে। সে নিজের শরীরে এখন সেই তাপ অনুভব করছে।

উঠে বসলো। অমনি নাকে পচা মাংসের গন্ধ এল। সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হল। মুগুরটাকে শক্ত হাতে চেপে ধরলো। গুহার মধ্যে লগুড়টাকে কি ভাবে চালাবে তা ভাবলো না। আক্রমণ প্রতিরোধ করার ইচ্ছায় চিবুক তার শক্ত হয়ে গেল।

শক্ত হয়ে সে বসে থাকলো দীর্ঘ সময়। তারপর বুঝতে পারলো পচা মাংসের গন্ধ আসছে গুহার মুখ থেকে। এবার সে লগুড় নিয়ে গুহার মুখের কাছে যাবার সিদ্ধান্ত নিল। সাবধানে গুহার মুখে যেতে হবে, সামান্যতম শব্দ করা যাবে না। ফোলা পাখানা নিয়ে গুহার মুখে যাওয়া সহজ কাজ নয়। হাতে তার লগুড়টা রাখতেই হবে। এখন তাকে সেই কঠিন পরীক্ষায় নামতে হবে।

সে বুকে হেঁটে গুহার মুখের দিকে এগিয়ে যেতে শুরু করলো। ফোলা পাখানাকে সাবধানে পাথরের ওপর ঘষে ঘষে সামনের দিকে টেনে নিয়ে যেতে হচ্ছে। তার ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে তবু থামার কথা ভাবতে পারছে না।

গুহার মুখে এসে দেখতে পেল জানোয়ারটাকে।

চাঁদ এখন মাঝ আকাশে। চাঁদের আলো গুহার মুখে। গুহার মুখের কাছ থেকে নিচের দিক অন্ধকার। অন্ধকারের মধ্যে গুহা মুখে প্রসারিত একখানা পাথর। পাথরখানা খাড়া হয়ে আছে বলে গুহার ওপরে উঠা একটু কঠিন। দু'হাত দিয়ে ধরতে না পারলে ওপরে ওঠা যায় না। মানুষের পক্ষেই একমাত্র সম্ভব ঐ পাথরখানা বেয়ে ওঠা। কোন জানোয়ার ওপরে উঠতে চাইলে তার পা পিছলে যাবে। পা পিছলে গেলে আছাড় খেয়ে পড়তে হবে অনেক নিচে।

জানোয়ারটা বিপদজনক খাড়া পাথর বেয়ে ওঠার চেষ্টা করেনি। প্রসারিত একখানা পাথরের ওপর চুপচাপ বসে আছে। দৃষ্টি গুহার মুখে। গুহার মধ্যে উঠে আসবার কৌশল মনে মনে ভাজছে।

সে জানোয়ারটিকে দেখতে পেয়ে ঘাবরে গেল না। গুহার দেয়াল ঘেসে বসলো লগুড় বাগিয়ে।

খতনার জানোয়ারটা চুপচাপ বসে আছে। শিকার তার নাকের ডগায় কিন্তু ঝাপিয়ে পড়তে পারছে না। খাড়াই পাথর খানা ভয়ানক অন্তরায় হয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। খাড়া পাথর খানা বেয়ে উঠতে সাহস পাচ্ছে না। মুখের সামনে খাদ্য পেয়ে চলে যাওয়া সম্ভব নয়।

নিরূপায় জানোয়ারটা উপত্যকার দিকে তাকাচ্ছে। আবার মুখ ঘুড়িয়ে গুহা মুখের উচ্চতা জরিফ করছে।

চাঁদ খানিকটা নিচে নেমে গেল। এবার চাঁদের আলো খতনার জানোয়ারটার মুখের উপর। গোল দুটি চোখের মধ্যে লোভের আগুন ধিক ধিক করে জ্বলছে। থেকে থেকে লেজ নাড়ছে। জিভ বের করে এক একবার মুখ চেটে নিচ্ছে।

চাঁদের আলোতে দেখতে পেল বাঘটাকে। এখন বাঘের পিঠের উপর আলো। কচি হলুদ রঙে পিঠ উজ্জ্বল। মাঝখানে ডোরা ডোরা কালো দাগ। কালো দাগ হলুদ পিঠ বেয়ে বুকের দিকে নেমে গেছে। বাঘটার একখানা কান নেই।

বিপদজনক কোন শিকারে একখানা কান হারিয়েছে। কান নেই দেখে এবার সে ভয় পেল। বাঘটা বাচ্চা বাঘ কিন্তু দুঃসাহসী। লোভের বসে হটকারীতা করতে পারে। নয়তো দু'দুটো কান তার মাথার উপর থাকতো। নির্মম সত্য যে একখানা কান নেই শালা শয়তান, সে মনে মনে খিস্তি দিল।

বাঘটাকে গালাগালি করে কোন লাভ নেই, এখন তাকে ভাবতে হবে কি ভাবে খতনায় জানোয়ারটাকে আটকাবে যদি লাফ মারে তবে গুহার মুখের নিচেই তাকে লগুড় দিয়ে আঘাত হানতে হবে নিখুঁত আঘাত হানতে হবে গুহার মুখে উঠে আসার আগে। মুখ গুহার মুখে আসতেই নাক বরাবর সপাটে আঘাত করতে হবে। শূন্য পথে নির্ভুল আঘাতে বাঘ নিচে পড়ে যাবে। তখন বাঘ তার থাবা দিয়ে গুহার মুখ চেপে ধরবার চেষ্টা করবে। যদি সফল হয়? সঙ্গে সঙ্গে থাবার উপর আর একটা আঘাত হানতে হবে।

গুহার মধ্যে বসে লগুড় মাথার উপর তুলে ধরা যাবে না। লগুড় কাত করে মারতে হবে। সে আর একটু সরে বসলো। লগুড় এমন ভাবে শুইয়ে রাখলো যাতে মুহূর্তে তুলে আঘাত করতে পারে।

বাঘ স্থির হয়ে বসে আছে। প্রতীক্ষা করছে সুযোগের আশায়। সে সুযোগ হল পাথর খানাকে ডিঙ্গিয়ে যেতে পারায়। এক লাফে পাথর ডিঙ্গোতে হবে। নিখুত লাফের ওপর নির্ভর করে আছে ভবিষতের সাফল্য। কি ঘটতে পারে তাই সে আপন মনে ভেবে যাচ্ছে। দু' জন দু' জায়গায় বসে আছে। মানুষ বাঘের খাদ্য। অবশ্য খাদ্য ভাবলেই খাদ্য হয় না। কৌশলে অথবা গায়ের জোরে খাদ্যকে খাদ্যে পরিণত করতে হয়।

সাদা চামড়ার মানুষেরা নানা রকমের কৌশল জানে। সাহস আছে লাফ দেবার মত। সমতলের মানুষরা সাদা চামড়ার মানুষদের মত কৌশলে দোসর কিন্তু ভীতু। তাই সাদা চামড়ার মানুষদের গোলামী করে। সাদা চামড়ার মানুষরা জানে কি ভাবে কালো

মানুষদের ক্ষেত খামার গিলে খেতে হয়। তাদের এঁটো খায় সমতলের মানুষেরা।

চাঁদ আরো নিচে নেমেছে। এবার বাঘ আরো স্পষ্ট হল। মুখে পিঠে তার আলো। কালো ডোরা দাগের পাশে হলুদ রং চক্‌চক্‌ করছে। নাকের ছু'পাশে গোঁফ মেলে দিয়ে বসে আছে। মাঝে মাঝে জিভ দিয়ে ওপরের ঠোঁট চাটছে। শালা—

এই জেগে বসে থাকা, সে ভাবছে। এ হল মৃত্যু সামনে রেখে বসে থাকা। এখন এ ভাবে তাকে মৃত্যুর সামনে বসে থাকতে হবে। কে মরবে সেই হল এখনকার প্রশ্ন। এক জনকে তো মরতেই হবে। কিন্তু কত সময় এ ভাবে বসে থাকা যায়। কপালে লেখা ছিল বলে এমন ঘটনা ঘটছে। দূর দূর থেকে ছুটো প্রাণি এসে মুখো মুখি বসে আছে। একজন ক্ষুধার্ত অন্য জন বাঁচার তাগিদে একটা ফোলা পা টানতে টানতে এসে খাদকের মুখোমুখি।

কে কাকে মারবে—এ বড় জটিল প্রশ্ন। হয়তো খোকা বাঘটাকে মরতে হবে মানুষের বুদ্ধি বেশি তাই। সাদা চামড়ার মানুষরা জিতে যায় বুদ্ধি আর বন্দুকের জোরে। সমতলের মানুষরা জেতে ধূর্ততায় ওস্তাদ বলে। অবশ্য এ সব বদমাইসী আর তঞ্চকতা তারা করে পাহাড়ের মানুষদের সঙ্গে। তাদের থেকে অনেক বেশি ধূর্ত আর সাহসী সাদা চামড়ার মানুষদের কাছে কেঁচো হয়ে থাকে। বশ্যতা স্বিকার করে।

তার হাতে একটা লগুড়। এ অস্ত্র ছুর্বল। তবু তাকেই প্রথম এগিয়ে যেতে হবে। একটা ক্ষুধার্ত বাঘের মুখোমুখি সারা রাত জেগে বসে থাকা যায় না।

একটা মানুষের মধ্যে আর একটা মানুষ থাকে। ভিতরের সেই মানুষটা ঘুমিয়ে থাকে বলে তাকে চেনা যায় না। কখনো কখনো সে জেগে ওঠে। তখন সেই মানুষটা অনেক কিছু করতে পারে। চুয়ার

আর সাঁওতালদের মধ্যে সেই ভিতরকার মানুষটা জেগে উঠেছিল। অমনি ভূমিজ আর সাঁওতাল সমাজ বদলে গেল। সাদা চামড়ার মানুষদের পায়ের নিচে বসে থাকা মানুষগুলো ক্ষেপে গেল। আরম্ভ হল যুদ্ধ। সাদা চামড়ার মানুষেরা গুলি মারছে। ক্ষেপে যাওয়া সাঁওতালরা ছুরছে তীর। তীরে গেঁথে যাচ্ছে দীকুরা। দীকুরা যে সামনে। পিছনে সাদা চামড়ার মানুষেরা। তারা সামনে আসছে না। দীকুদের হাতে গুলি তুলে দিচ্ছে দিকুরা চুয়ার আর সাঁওতাল মারছে।

কলজেতে জোর চাই। কলজেতে জোর থাকলে নিজ থেকে ভিতরের মানুষটা জেগে ওঠে। ঐ ভিতরের মানুষটাই সব। নয়তো শনিয়ালালকে খুন করার কথা তার মাথায় আসতো না। তার নামে সবাই ভয় পায়। সে নিজে ভয় পেত। নিরবে দাঁড়িয়ে থেকে তার কত রকম খতনার অত্যাচার আর শোষণ সহ্য করেছে। প্রতিবাদ করার কথা মনে আসে নি। ভীরুতা গলায় একটা ফাঁস পড়িয়ে রেখেছিল।

এ রকম হবার কথা ছিল না। তার মনে এল আবার বিদ্রোহীদের কথা। বোঙা তাদের ভিতরের মানুষটাকে সোখা (সিদ্ধ পুরুষ) করে দিয়ে ছিল। তারা বাঘের মত গর্জন করে পাহাড় ধরে নাড়িয়ে দিল। সাঁওতালদের ডেকে বললো, ঠাকুর বাবা 'পরথম' বুড়ো-বুড়ীকে 'সিজন' করেন।

সবাই বললো, হোয় হোয়।

'সিজন' করে 'হিহিড়ি পিপিড়িতে' পাঠিয়ে দেন।

হোয় হোয়।

আমরা 'খেড়ওয়াল হড় হপন' (সন্তান) আদি কালের মানুষ।

হোয় হোয়।

'হিহিড়ি পিপিড়ি' থেকে আমাদের জাত ভাইরা চাঁই চম্পাতে" চলে আসে।

হোয় হোয়।

এ রকম ভাবে আদি পুরুষ ধরে চান্দোবোঙার নাম নিয়ে কথা বলতে শুরু করতে হয়। এ সব কথা বললে ভিতরের মানুষটা সহজে জেগে ওঠে।

গাঁও বুড়োরা তো বলে, ভিতরের মানুষটা মরে না। সে হাওয়ার মধ্যে ভাসে। ইচ্ছে করলে গাছ, পাথর, বনের জানোয়ার, আর কত কিছু হতে পারে। আবার তার মনে এল শনিয়ালালের কথা। শনিয়ালাল মরেনি। সে খতনার বাঘ হয়ে আবার ফিরে এসেছে। এখন সে গুহার নিচে পাথরের উপর বসে আছে। সারা রাত বসে থাকবে না। তাকে এক সময় লাফ দিতে হবে এইত নিয়ম।

অসহ্য এই নীরবতা আর অপেক্ষা, সে ভাবলো। তখন তার মনে এল পাথরের টুকরোগুলোর কথা। কতগুলো পাথরের টুকরো দেখেছিল গুহার দেওয়ালের কাছে। দু'একটা বড় পাথরের টুকরো ছিল। তখন ভাল করে দেখে নি। এখন সেই পাথরগুলোর কথা মনে আসছে। পাথরের টুকরোগুলোর একটা হাতে পেলে প্রথম সে আক্রমণ করতে পারে।

এখন গুহার মুখ থেকে সরে যেতে চাইলেই সরে যাওয়া যাবে না। তার পাশে চাঁদের আলো। নড়লে বাঘ টের পাবে। সে লাফ দেবে। তাকে একটু একটু করে সরে পাথরগুলোর কাছে যেতে হবে। সামান্যতম আওয়াজ হতে দেওয়া চলবে না। এই মোটা পাথরের মত ভারি পা নিয়ে এ ভাবে সরে যাওয়া অসম্ভব।

কিন্তু তাকে এখন অসম্ভবকে সম্ভব করতে হবে। ফোলা পায়ে ব্যথা লাগলো কি লাগলো না ভাবা চলবে না। সে একটু একটু করে নিজেকে ভিতরে সরিয়ে নিতে শুরু করলো। পায়ে লাগছে। সে আপন মনে বললো, লাগুক। দীর্ঘ সময় ধরে চেষ্টা করে সে নিজেকে নিয়ে যেতে পারলো পাথর খণ্ডগুলোর কাছে।

আবার শুরু হল গুহামুখে নিঃশব্দে আসার দুরূহ প্রয়াস। ছায়া

নড়লেই বাঘ লাফ মেরে বসবে। এ বাঘটা হঠকারিতা করতে পারে। একটা কান হারিয়ে সে তার হঠকারিতার প্রমাণ দিয়েছে। নয়তো সে এতো চিন্তিত হত না। খাড়া পাথর বেয়ে ওঠা বাঘটার পক্ষে অসম্ভব। প্রথম বাঘ সে চেষ্টা করেছে। সে ঘুমিয়েছিল বলে টের পায়নি। সফল হতে পারেনি বলে নিচের পাথরে নেমে বসে আছে এক লাফে দূরত্ব পার হতে পারবে কিনা বাঘের মনে সে সন্দেহ আছে। সন্দেহ আছে বলে সে লাফ মারছে না। কিন্তু ছায়া নড়তে দেখলে তাকে দেখতে পাবে। আর ধৈর্য রাখতে পারবে না লোভী বাঘ। অমনি লাফ দেবে। হয়তো দূরত্ব অতিক্রম করা সম্ভব হতে পারে। এই হয়তো বা যদির প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। যদি পারে, যদি হয়—এই যদির সম্ভাবনা তাকে সতর্ক থাকতে বাধ্য করছে। এখন নিজে প্রথমণ আক্রম করে নিশ্চিন্ত হতে চাইছে।

সে ক্রমপর্যায় গুহার মুখের কাছে এসে পৌছল। ধীরে ধীরে একটু একটু করে ফোলা পাথানাকে পিছন দিকে সরিয়ে নিলো। তারপর এক পায়ের ওপর সে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারলো। এবার তাকে পাথর সমেত হাত মাথার ওপর তুলে আনতে হবে। একটু একটু করে হাত ওপরে তুলছে। হাত মাথার ওপর ওঠেছে। বাঘ একইভাবে বসে আছে। ছায়া নড়ছে না বলে বুঝতে পারছে না কি ঘটতে যাচ্ছে।

হাতের পাথর ছুড়ে মারলো নিশানা লক্ষ্য করে।

লক্ষ্যভ্রষ্ট হলনা সে। পাথর গিয়ে আঘাত করলো মাথার ঠিক মাঝখানটায়। হঠাৎ আঘাতে বন কাঁপিয়ে হুঙ্কার দিয়ে উঠলো বাঘ। লাফ মারলো সঙ্গে সঙ্গে। ধাক্কা খেল সামনে এগিয়ে থাকা পাথরের চাতালে। ঝপাৎ করে আছড়ে পড়লো নিচে। নিচের জঙ্গল তোলপার করলো খানিক সময়। আবার নিস্তব্ধতা নেমে এল।

বাঘটা মরেছে কিনা বুঝতে পারছে না। আহত হয়ে পালিয়ে যেতে পারে। আবার ফিরে আসতে পারে। সে লগুড় এবার হাতে

তুলে নিল। দাঁড়িয়ে রইল গুহার মুখে। পাহাড়ের নিচের দিক অন্ধকার। বাঘের বসে থাকা পাথরে চাঁদের আলো। রক্ত দেখতে পেল সে। তবু নিজের ভিতর স্বস্তি পাচ্ছে না। ঘুম আর এল না। লগুড় হাতে নিয়ে গুহার মুখে বসে রইল।

এবার সে গুহার মধ্যে পড়ে থাকা পাথরখণ্ডগুলো নাড়াচাড়া করে দেখে নিল। একখানা ধারালো পাথর পেয়ে গেল। পাথরের প্রান্ত সীমা থেকে চাকলা তুলে ফেলা হয়েছে। পাথরখণ্ড লম্বা এবং সূঁচালো। গাছের ডালের সঙ্গে বাঁধলে একখানা বর্শার মত অস্ত্র হতে পারে।

হাতে একটা লগুড় অপেক্ষা একটা আনাড়ী বর্শা অনেক বেশি কার্যকরী। অভিজ্ঞতা তার সাহস বাড়িয়ে দিল। এখন তাকে একটা বর্শা তৈরী করে নিতে হবে, পাথরের বর্শা। টাঙ্গীর কথা মনে এল। টাঙ্গীখানা হাতে থাকলে অনেক নিশ্চিন্তে বাস করতে পারতো। মানুষের মধ্যে ফিরে যাবার কোন আগ্রহ তার নেই। সাদা মানুষের হাতে মৃত্যু পছন্দ করতে পারছে না। ছগণ আর সুখনের মত গাছের ডালে ঝুলে মরার অর্থ একটা পশুর মত মরা। মানুষ মরবে মানুষের মত। চাটাইতে লম্বা হয়ে শুয়ে থাকবে মানুষটা —অথচ সে নেই। সবাই তাকে ঘিরে বসে আছে, বসে বসে কাঁদছে —এই হল মানুষের মত মানুষের মরণ।

কিন্তু এখন মানুষ আর মানুষের মত মরতে পারছে না। এক সময় তারা চাটাইয়ের ওপর শুয়ে মরত। এখন সাদা চামড়ার মানুষরা চাটাই থেকে মানুষকে টেনে তুলে নিয়ে যায়। দাঁড় করিয়ে দেয় একটা গাছের নিচে। বনের শেয়ালকে যে ভাবে মারে তেমান করে গুলি ছুড়ে মেরে ফেলে। লাশটাকে ঝুলিয়ে দেয় গাছের ডালে। শেষকৃত্য পর্য্যন্ত করতে দেয় না। সে ঘৃণার সঙ্গে থুথু ফেললো গুহার দেওয়ালে।

আবার মনে এল টাঙ্গীর কথা। এই গভীর বনে মানুষ আসে না। জানোয়ারের রাজ্য। তাকে এখন বেঁচে থাকতে হবে একটা জানোয়ারের মত। টাঙ্গীখানা হাতে থাকলে বেঁচে থাকতে পারা অনেক সহজ হত।

টাঙ্গীর কথা বার বার তার মনে জাগছে। টাঙ্গীর ভাবনা বেশি সময় থাকলো না। টাঙ্গীর কথা ভেবে আর নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে পারছে না। এখন সে ক্ষুধার্ত। কয়েকটা দিন কেটে গেল খাবার মত কোন খাবার না খেয়ে। এখন সেই না খেয়ে থাকার দুর্ভাগ্য তাকে তাড়না করছে। সঙ্গে আছে তৃষ্ণা।

থুথু দিয়ে বার বার গলা ভিজিয়ে নিচ্ছে। গলা ভিজে থাকছে না। পাহাড় থেকে নামতে পারলে প্রাণ জুড়িয়ে জল পান করতে পারতো। পাহাড়ের পিছনেই আছে সেই জলাশয়। এখন রোদের আলোতে সে জল রুপোর পাতের মত জ্বলছে। তবু সে গুহা থেকে নিচে নামার কথা ভাবতে পারছে না।

বাঘটা কি মরেছে? আপন মনে মাথা নাড়লো। অন্য রকম হতে পারে। হয়তো সে মরেনি। আঘাত পেয়ে সরে গেছে। নিরস্ত্র মানুষের গন্ধ পেয়ে দূরে চলে যায় নি। কাছাকাছি কোথাও থাবা গেড়ে গুৎ পেতে বসে আছে।

সূর্য আরো ওপরে উঠে এসেছে। এবার সে নিচে নামবে। তাকে নামতেই হবে। না নেমে আর উপায় নেই। এমনি করে মানুষ একের পর এক ঘটনা ঘটিয়ে চলে। এই যেমন সে এখন নিজেকে নিজে নিচে নিয়ে যাবে। নিচে নামা বিপজ্জনক জেনেও নিচে নেমে যাবে। ক্ষুধা আর তৃষ্ণা তাকে বাধ্য করছে বিপজ্জনক সিদ্ধান্ত নিতে। হয়তো আহত বাঘটা এ রকম এক সিদ্ধান্ত নিয়ে পাথরের আড়ালে চুপ করে বসে আছে। তার মাথায় চোট লেগেছে, তবু তাকে বসে থাকতে হচ্ছে। তার পেটের ক্ষুধা তাকে বসে থাকতে বাধ্য করছে। একটা লগুড় হাতে মানুষ কতটা বিপজ্জনক হতে

পারে তাতো আর জানা নেই।

সে গুহা থেকে নামলো। নামা সহজ হল না। পা আরো ফুলেছে। মালাইচাকি অনেকটা দূরে সরে গেছে। পাখানা ভারি আর শক্ত হয়ে আছে। ফুলে ওঠা পাখানা এখন যেন আর একটা মানুষ। সোজা হয়ে আর দাঁড়াতে পারছে না। তবু তাকে নিচে নামতে একের পর এক পাথর টপকাতে হবে।

একের পর এক পাথর সে টপকালো। বার বার মাথার মধ্যে তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করছে। তবু থামলো না। থামার কোন উপায় নেই। একটা কিছু তাকে খেতে হবে। নয়তো পেটের নাড়ীভুঁড়ি পর্যন্ত হজম হয়ে যাবে।

খানিকটা পথ নিচে নেমে দেখতে পেল বাঘটাকে। পাথরের ওপর পা ছড়িয়ে পড়ে আছে। মাথা পাথরে লেগে থেৎলে গেছে। খুলি ভেঙ্গে খানিকটা দূরে ছিটকে পড়ে আছে।

পায়ে পায়ে [illegible] বাঘের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। [illegible] বাঘের ঘিলু পাথরের উপর পড়ে আছে। সাদা থকথকে। [illegible] তার ক্ষুধা আরো বেড়ে গেল। তখন তার আগুনের কথা মনে এল। আগুন থাকলে এখন বাঘের দাবনা ঝলসে খেয়ে নিত। [illegible] অবশ্য বাঘের মাংস খাবার মত নয়।

ছাল খানা ছাড়িয়ে নেওয়া যাবে না। হাতে কোন অস্ত্র থাকলে হৃদপিণ্ড ছাড়িয়ে নিয়ে খেতে পারতো। হৃদপিণ্ড নরম। তার স্বাদ আলাদা। এখন সে সুযোগ নেই। থেতলে যাওয়া মাথার মাংস আর ঘিলু একমাত্র ভরসা।

তোমাকে এখন কিছু একটা খেতে হবে, সে নিজেকে নিজে বললো। কোনটা খাবে আর কোনটা খাবে না—এসব কথা ভাবলে চলবে না। বাঁচতে চাইলে যা পেয়েছ তাই খেয়ে নাও।

সে বাঘের মাথার সামনে বসলো। কয়েক দিন ধরে না খেয়ে থাকার ক্ষুধা তাকে উন্মাদ করে দিতে চাইছে। পেটের মধ্যে এখন

আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে

প্রাপ্তির আনন্দে তার চোখ উজ্জ্বল। এক সঙ্গে এত খাবার কল্পনায় ছিল না। খেতে হবে কাঁচা। তারজন্য এখন তার কোন দুঃখ নেই। বস্তির বুড়োরা বলে, যখন তুমি জঙ্গলে তখন জঙ্গলের নিয়ম মেনে চলবে। জঙ্গলের নিজের একটা নিয়ম আছে, সেই নিয়ম তোমাকে মেনে চলতে হবে। কিন্তু জঙ্গলের নিয়ম বস্তিতে আনবে না। পথের বাঁকে জঙ্গলের নিয়মগুলো কাঁধ থেকে নামিয়ে রাখবে

এ সব নিয়ম সাদা চামড়ার মানুষরা মানে না। সমতলের মানুষদের নিয়ম পদ্ধতি অন্যরকম। তাদের যা খাবার সব ঘরের মধ্যে বসে খায়। সবাইকে নিয়ে বনের মধ্যে বসে হরিণের মাংস ঝলসে খেতে জানে না। যে শিকার করবে সে হরিণটার দখল নেবে। কাঁধে চাপিয়ে নিজের ঘরে চলে যাবে। তোমরা যারা সঙ্গে ছিলে, শিকার করতে পারলে না তাদের কথা ভাববে না।

সবাইকে নিয়ে আগুনের পাশে বসে খেতে পাবার মধ্যে আছে অন্য রকমের আনন্দ। মাংসের ভাগে অংশটুকু তুমি কিছুতেই নিজের জন্য কেটে নিতে পারবে না। মনে হবে তুমি স্বার্থপর হয়ে যাচ্ছ। স্বার্থপর হওয়া মানে একা হয়ে যাওয়া।

এই এখন যেমন আমি একা, সে ভাবলো। বিমর্ষ হয়ে পড়লো। আবার মনের ভাব বদলে গেল। মরা বাঘটাকে দেখলো। তেমন বয়স হয়নি বাঘটার। কচি খোকা বলা যেতে পারে। মাংস নরম হবার কথা। চামড়া খানাও চমৎকার। উজ্জ্বল হলুদ রং রোদের আভায় জ্বলছে। চামড়াখানা ফেলে দেওয়া চলবে না। রাখতে পারলে অনেক কাজে লাগবে। গুহার মুখে টান টান করে ঝুলিয়ে দিলে শীতের হাওয়া গুহার মধ্যে ঢুকতে পারবে না।

নানা রকম ভাবনায় খানিকটা সময় কেটে গেল। সব শেষে সে আপন সিদ্ধান্তে এল। চামড়াখানা সে রাখবে। মৃত দেহ কাঁধের ওপর তুলে নিল। আবার শুরু হল পাহাড়ে ওঠা। তখন শকুন

দেখতে পেল আকাশে। বিশাল ডানা মেলে আকাশে চক্কর মারছে।

খাড়া পাথর বেয়ে ওপরে ওঠার চেষ্টা করলো না। বাঘের ঠ্যাং দুটো ধরে মাথার উপর পাক দিয়ে ছুড়ে দিল। বাঘ ছিটকে পড়লো গিয়ে গুহার মধ্যে তার পায়ে ধাক্কা লাগাতে ব্যথা লাগলো। এত জোরে লাগলো যে সে আর্তনাদ করে উঠলো। খানিক সময় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে পায়ের যন্ত্রনা সহ্য করার চেষ্টা করলো। হাঁটুর মধ্যে কে যেন কড়াৎ চালাচ্ছে।

আবার তাকে নিচে নামতে হল। লগুড় মুঠো করে ধরলো। এবার তাকে আরো নিচে নামতে হবে। খাবার কিছু পেটে যাওয়াতে কলজের জোর ফিরে এসেছে।

নিচে নামতে পারলেই সমতল ভূমি। পাহাড়ের গা থেকে যেন একখানা জিভ সামনের দিকে প্রসারিত করে রেখেছে। সবুজ ঘাস শেষ প্রান্তে জল। লগুড়ে ভারসাম্য রেখে সে এগিয়ে চললো। পৌছে গেল জলের কাছে।

দুপুরের রোদে জল টলমল করছে। সে জলের কাছে নেমে গেল। দু'হাত দিয়ে জল তুলে পান করলো। খানিকটা জল মাথায় গায়ে ছিটিয়ে দিল। গা মাথা ভিজে যাওয়াতে আরাম বোধ করলো। এবার সে জলে নেমে গেল। জলের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিল। স্নিগ্ধ আবেশ তাকে জড়িয়ে ধরলো। আর জল থেকে উঠতে ইচ্ছে করছে না। সারা শরীর বেয়ে আরাম মাথার মধ্যে উঠে আসছে। কে যেন মাথার মধ্যে নরম পালক বুলিয়ে দিচ্ছে। আধো ঘুম আধো জাগরণের মত এক আবেশ তাকে পেয়ে বসেছে।

এখন সে একখানা পাথরের ওপর চেপে বসে আছে। পা দুটিকে ডুবিয়ে রেখেছে জলের মধ্যে। স্নিগ্ধ আবেশ পা বেয়ে ওপর দিকে উঠে আসছে। জলের মধ্যে তার ছায়া ঝাপসা। দু'একটা ছোট মাছ ছায়ার মধ্যে ক্রমাগত পাক খাচ্ছে। সে ভাবছে অন্য কথা।

জল সঙ্গে করে গুহায় নিয়ে যেতে পারলে কত সুবিধা হত তার। একটা জলের পাত্র পেলে কাজে লাগতো। বস্তিতে তারা মাটির তৈরী পাত্র ব্যবহার করে। কাঠ কুঁদে নানা রকমের পাত্র তৈরী হয়। মাটির পাত্র তৈরীর পদ্ধতি অজানা নয়। চাকা না থাকলেও মাটির পাত্র তৈরী করা যায়। পোড়াবার কাজ সহজ নয় বরং অনেক ঝামেলার। প্রথম দরকার আগুন। ব্যাস হয়ে গেল। আগুন সে কোথায় পাবে?

দুটো ভাবনা তার মাথায় পাশাপাশি আসছে। প্রথম মাটির পাত্র তার পিছনে আগুন। তাতেই প্রয়োজন শেষ হবে না। মানুষকে বেঁচে থাকতে হলে আরো নানা রকমের উপকরণ লাগে। কিন্তু কতটা লাগে? একটা মানুষ আর তার ছেলে মেয়ে নিয়ে এক সংসার। সংসার চালিয়ে নিতে কি কি দরকার তা তোমাকে জানতে হবে। সেগুলো সংগ্রহ করে আন। বারতি যা যা সেগুলো হল বোঝার দল।

কি, ঠিক বলেছি? সে জলের মধ্যে তার ছায়াকে জিজ্ঞাসা করলো। ছায়া কোন জবাব দিল না। এবার সে নিজেই একটা মানুষ আর তার সংসারে কি দরকার তার কথা ভাবতে শুরু করলো। মানুষকে বেছে সব কিছু ঠিক করতে হয়। মানুষের মন অনেক কিছু চায়। সব চাওয়াগুলিকে মেটাতে গিয়ে মানুষ শনিয়ালাল হয়ে যায়। মানুষের চেহারায় একটা নেকড়ে। মানুষ নেকড়ে হয়ে গেলে আর মানুষ থাকে না।

হাতের লগুড় নিয়ে এখন সে অনেকটা বলিষ্ঠ পায়ে হাঁটতে পারছে। পেটপুরে মাংস খেয়েছে। জল খাওয়াতে কাঁচা মাংসের গন্ধ আর টের পাচ্ছে না। পেট ভর্তি থাকাতে কলজের জোর আবার ফিরে এসেছে। এখন আর ভয় পাচ্ছে না। এমনকি ফোলা পায়ের কথাও ভাবছে না। পায়ে যন্ত্রনা আছে সে গ্রাহ্য করছে না।

নিজের মধ্যে এক রকমের উদ্দীপনা অনুভব করছে। মরবার জন্য পৃথিবীতে আসে নি। মারবার জন্যও নয়। তবু মানুষকে মরতে হয়। কখনো কখনো নিতে হয় হত্যাকারীর ভূমিকা। মানুষ বাঁচার জন্য পশু শিকার করে। কিন্তু মানুষ মানুষকে শিকার করে—এ হল সব থেকে জঘন্য কাজ। মানুষ মেরে মানুষর মধ্যে বেঁচে থাকা মানে নরকের মধ্যে বেঁচে থাকা। সাদা চামড়ার মানুষরা নরকের কীট হয়ে বাঁচে। শনিয়ালালের মত মানুষরা নরকের এঁটো খায়। লোভী মানুষ এক ঘৃণ্য জীব।

মাঠের মাঝখানে একটা লতা দেখতে পেল। মনোমত হওয়াতে খানিকটা ছিঁড়ে নিল। পাহাড়ের নিচে এসে দাঁড়ালো। এবার তাকে ওপরে উঠতে হবে। একবার পিছন ফিরে তাকালো। এখন তার পিছনে সবুজ মাঠ। মাঠের শেষ প্রান্তে আর একটা পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে গাছের পর গাছ দাঁড়িয়ে আছে আদিম যুগের প্রহরীর মত।

তার চারপাশে গভীর অরণ্য। এই অরণ্য কতকাল ধরে এমনি দাঁড়িয়ে আছে কে জানে। অরণ্যের মধ্যে সে একা—একমাত্র মানুষ।

সারা শরীর কাঁপিয়ে একটা শিহরণ খেলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে শক্ত হয়ে দাঁড়ালো। সবার প্রথম মনে এল বাঁচার কথা। তার এই বেঁচে থাকা সব থেকে বিস্ময়কর! তাকে বেঁচে থাকতে হবে। প্রতি মুহূর্তে শিকার হবার সম্ভাবনা নিয়ে থাকতে পারা হল আরণ্যক জীবন। তার জীবনে অন্যথা হবার কোন উপায় নেই।

পাহাড় বেয়ে উঠতে আর আগের মত কষ্ট হল না। গুহার মুখে উঠে সে বুঝলো শরীরের পক্ষে পেটভর্তি খাবার কতটা কার্যকরী। আসলে খাদ্যই হল শক্তি। অবশ্য কি খাবো প্রশ্ন খুব জরুরী। অবস্থা বিশেষে সব খাদ্যই খাদ্য। মানুষ সব কিছু খায়। একমাত্র মানুষ মানুষের মাংস খায় না। যদি খেত?

প্রশ্ন মনে জাগতেই সে থমকে গেল। ভাবতে চাইলো, মানুষ

মানুষের খাদ্য হলে শনিয়ালালের দল কি করতো। সে আর ভাবতে পারছে না। খানিকটা সময় পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল। মনে এল বোঙ্গাঠাকুরের কথা বোঙাকে প্রনাম জানালো। বোঙা সব কিছু খেতে শেখায় নি। তাই মানুষ মানুষ খায় না। সাদা চামড়ার মানুষরা নাকি মানুষর হাড় গুঁড়িয়ে খায়। হাড় খায় মাংস খায় না?

গুহায় উঠে দেখতে পেল খোকা বাঘটাকে ঠ্যাং ছড়িয়ে শুয়ে আছে চারটে পা টান টান হয়ে আছে ইতিমধ্যে ফুলতে শুরু করেছে মানুষটি হাসলো। মনে মনে বললো, আমাকে খেতে এসেছিল, আমি তোকে খেয়ে নিলাম। এবার আমি তোর কলজের মাংস দাঁত দিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে খাব একটা বাঘের কলজে একটা মানুষ খাচ্ছে। হঠাৎ সে কৌতুকে খল খল করে হেসে উঠলো।

হাতের লগুড় আর লতা নামিয়ে রাখলো। এবার চামড়াখানা খসিয়ে নিতে হবে বাঘের একটা দাঁত খসিয়ে নিয়ে চামড়া খসাবার চেষ্টা করলো। সুবিধা হল না। এবার সে গুহার দেওয়ালের গায স্তূপ করে রাখা পাথরের টুকরোগুলোর কাছে গেল। মনে পড়ল বাঁশের কথা এক টুকরো কঞ্চি পেলে সহজেই ছাল ছাড়াবার কাজ করে ফেলতে পারতো। বস্তিতে তারা ছুরির বদলে কত সময় এক টুকরো বাঁশের ফালি দিয়ে কত রকমের কাটকুটির কাজ শেষ করে ফেলে।

আপাতত পাথরের টুকরোগুলোই তার ভরসা। পাথরগুলোর মধ্যে একখানা ধারালো পাথরের ফলা পেয়ে গেল। সে আঙ্গুল বুলিয়ে ধার পরীক্ষা করে নিল। প্রান্ত সীমায় ধার আছে, একটু পরিশ্রম করলে হয়তো ছাল ছাড়িয়ে নিতে পারবে।

চেষ্টা তাকে করতেই হবে, সে আপন মনে ভাবলো। পাথরের ফলা নিয়ে শায়িত বাঘের কাছে এসে বসলো। নিজের কোল

পাখানাকে লম্বা করে শুইয়ে দিয়ে বাঘের দেহ চিৎ করে দিল। এবার পাথরের ফলা বসিয়ে টান দিল। খানিকটা চামড়া কেটে গেলেও গভীর হয়ে বসলো না। চামড়ার নিচের সাদা অংশ ঝক্ ঝক্ করছে। এর নিচেই আছে লাল নরম মাংস। সে সাদা দাগের উপর পাথরের ফলা বসিয়ে আবার টান দিল। জোরের সঙ্গে টান দিতেই পাথর গভীর হয়ে বসে চামড়া চিরে গেল। আত্মপ্রকাশ করলো লাল মাংস।

পেরেছি, সে আনন্দে চিৎকার করে উঠলো। নিষ্পলকে তাকিয়ে থাকলো খানিক সময়। চামড়া গভীর ভাবে কেটে ছ'ভাগ হয়ে গেছে। এটা একটা সাফল্যের মত সাফল্য। তার হাতে আরো একটা অস্ত্র এল। লগুড় হত্যা করবে। পাথরের ফলা দিয়ে চাক চাক করে মাংস কেটে নিতে পারবে।

খানিকটা চেষ্টা করে চামড়াখানাকে খসিয়ে নিতে পারবে যে তাতে আর সন্দেহ রইল না। একটু বেশি জোর ব্যবহার করতে হচ্ছে। কিন্তু কাজ ধীর গতিতে এগিয়ে চলছে। যত চামড়া কাটছে তত তার আনন্দ বাড়ছে। ভাবছে, এটা একটা কাজের মত কাজ। সব মানুষকেই কোন একটা কাজ করতে হয়। সে একটা কাজের মত কাজ করছে। প্রাণভরে আনন্দ অনুভব করা যায় এ রকম কাজে। কতখানি শক্তি খরচ করল সে হিসাব মনে আসবে না। তারা এমনি ভাবেই কাজ করে। যা করে আনন্দের সঙ্গে করে।

কাজে সে আনন্দ এখন আর নেই। সাদা চামড়ার মানুষ আর দীকুরা কাজ করার আনন্দ শেষ করে দিয়েছে। এখন তারা কাজ করে বাঁচার জন্য। পিতৃপুরুষেরা বাঁচার জন্য কাজ করেনি। বুড়োরা হারিয়ে যাওয়া সে সব দিনের কথা বলে। তারা জানতো কাজ করতে পারার মধ্যে কি পরিমাণ আনন্দ আর আত্মতৃপ্তি আছে।

চামড়া খসিয়ে ফেলার কাজ শেষ হয়েছে। কত সময় পার হয়ে গেছে। অনেক পরিশ্রম করতে হল তাকে। তবু শ্রান্তি অনুভব

করছে না। চামড়াখানা উল্টে পাল্টে দেখে সাফল্যের আনন্দে মন ভরে উঠলো। এবার চামড়াখানাকে গুহার বাইরে টান টান করে ঝুলিয়ে দিল। ফিরে এল গুহার মধ্যে। বাঘের দেহ এবার উল্টে দিল। পাথরের ফলা দিয়ে বুক চিরে ফেলতে চাইলো। তাকে আবার বিস্মিত কবে দিতে বুক চিরে হাঁ হয়ে গেল। দেখতে পেল কলেজখানাকে। এখনো তাজা আছে। সে কলজে উপড়ে তুলে আনলো। নরম তুলতুলে মাংস' সে পাথরের ফলা দিয়ে ডুমো ডুমো করে কাটবার চেষ্টা করছে। যে ভাবে চাইছে সে ভাবে হচ্ছে না কিন্তু কাজ এগিয়ে যাচ্ছে।

সে মনে মনে ভাবলো, কি চমৎকার এই হৃৎপিণ্ড। যখন এর ভেতর তাজা রক্ত থাকে তখন খেতে লাগে আরো চমৎকার। পিতৃপুরুষেরা জানতো কি ভাবে একটা পশুর তাজা হৃৎপিণ্ড খেতে হয়। তারা নিজেরা অনেক সময় খেয়েছে। তাজা হৃৎপিণ্ড খেলে জানোয়ারটা আর হারিয়ে যাবে না। তার সমস্ত শক্তি নিয়ে তোমার কাঁধে চেপে বসবে। তুমি আরো বলবান ও তেজী হয়ে উঠবে।

মাংসের টুকরোগুলো এবার সে পর পর সাজিয়ে রাখলো। রাত্রে খাবে। কালকে আর খাওয়া যাবে না। মাংসে পচন লেগেছে। মাংস শুকিয়ে রাখবে তা হবার নয়। সে মৃত বাঘের লাল মাংসের পানে তাকিয়ে রইল। তারপর ঠ্যাং দুটো ধরে টেনে গুহার মুখে নিয়ে এল। মাথার ওপর তুলে একটা পাক দিয়ে দেহটা ছেড়ে দিল। শূন্যে বাঘের দেহ পাক খেয়ে নিচের দিকে নেমে গেল। পাথরের ওপর আছড়ে পড়ার শব্দ শুনতে পেল।

শকুন নেমে আসলো নিচে।

দু'চোখে ঘুম নেমে এল। সে গুহার সংকীর্ণ কোণের মধ্যে ঢুকে টান টান হয়ে শুয়ে পড়লো। এবার ঘুমাবে। ঘুম গভীর হল না

স্বপ্ন দেখলো। একটা গুহার মধ্যে সে বসে আছে। তার পাশে আগুন জ্বলছে। আগুনের মাঝখানে একটা লাল গরু দাঁড়িয়ে আছে। গরুর গায়ে আগুন লাগছে না। গরুটা নড়ছে না। স্থির হয়ে আগুনের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে।

ঘুম ভেঙ্গে গেল। স্বপ্নের গরু হারিয়ে গেল। আগুনের কথা মনে গেঁথে থাকলো।

সে উঠে বসলো। আকাশে চাঁদ। জ্যোৎস্নার মায়াবী রূপ দেখছে না। আপন মনে ভাবছে স্বপ্নে দেখা আগুনের কথা। তাদের ঘরে আগুন ছিল। সারা বছর তারা আগুন জ্বালিয়ে রেখে রক্ষা করতো। এরজন্য শুকনো কাঠ মজুত করে রাখা হত। আগুন কাঠের গুঁড়ির মধ্যে ধিকি ধিকি জ্বলতো। দরকার মত কাঠে ফুঁ দিতে হত। অমনি কাঠের গুঁড়ির মধ্য থেকে লালাভ আগুন আত্ম-প্রকাশ করতো।

সব বাড়িতেই কাঠ জ্বালিয়ে আগুন রক্ষা করতো। এমনি করে বংশপরম্পরায় পিতৃপুরুষের হাত থেকে পাওয়া আগুন রক্ষা করে এসেছে। সাদা চামড়ার মানুষরা এ সব রীতি মানে না। তারা আগুন নিভিয়ে ফেলে। আবার দরকার মত জ্বালিয়ে নেয়। নিভে যাওয়া আগুন আবার যে কি ভাবে জ্বালে কারো জানা নেই। সাদা চামড়ার মানুষরা নানা রকমের অদ্ভুত কাজ করতে পারে। এর জন্য দীকুরা তাদের ভয় পায় অনুগত হয়ে থাকে। এখন তারাও অনুগত হয়ে পড়েছে।

তাতে কি লাভ হল, সে আপন মনে প্রশ্ন করলো। পিতৃপুরুষদের সমাজ আর থাকলো না। একের পর এক মানুষ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। মানুষটা এক রকম থাকছে কিন্তু ভিতরের মানুষটা পচে যাচ্ছে।

মন তার খারাপ হয়ে গেল। বুকের মধ্যে অসহায় এক যন্ত্রণা। দম বন্ধ হয়ে আসছে। ঘৃণা ঘৃণা। লোভের হাত ধরে সমাজ অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে। কি ভাবে সমাজ রক্ষা করা যায় জানে না।

জানলে শনিয়ালালকে খুন করে তাকে পালিয়ে আসতে হত না। ঘটনা অন্য রকম ঘটতো। কিন্তু কি ঘটতো, কি ঘটতে পারতো সে নিজেই জানে না।

টান টান হয়ে আবার শুয়ে পড়লো। টাঙ্গীর কথা মনে এল। অমনি মনে এল কাঁচা মাংস খাবার কথা। খেতে তেমন কোন অসুবিধা হয় নি। তবে ঝাল নুন থাকলে আরো ভালো হত। কাঁচা মাংস হজম করা একটু কঠিন। অবশ্য জঙ্গলে পথ হারিয়ে তারা কাঁচা মাংস খায়। বস্তি থেকে একটা মানুষ দূরে চলে গেলে কি করবে? হ্যাঁ, কখনো কখনো মানুষকে কাঁচা মাংস খেতে হয়। কি খাবে, কোন পদ্ধতিতে খাবে তা স্থির হয় পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে।

একটা কিছু খেতে হবেই। বেঁচে থাকতে হলে খেতে হয় এ হল বেঁচে থাকার সর্ত। সব থেকে আশ্চর্য ঘটনা হলেও সহজ সরল সত্য। সবাইকে খেতে হয়। জানোয়ার, পাখী, মানুষ সবার জীবনে খাওয়া হল সব থেকে বড় কথা। গাছ তাকেও খেতে হয়। শিকড়ে জলের যোগান চাই তবে সে বাঁচতে পারবে। তারা জঙ্গল হাসিল করে ক্ষেত তৈরী করে। কয়েক বছর চাষ করে সে জমি পতিত করে ফেলে রাখে। খেতের খাদ্য এক সময় শেষ হয়ে যায়। তখন মাঠে জঙ্গল হতে দিতে হয়। জঙ্গলের পোড়া ছাই হল শস্যের খাদ্য।

নানা রকমের ভাবনা তার মাথায় আসছে। অথচ এতদিন মাথায় এত রকমের ভাবনা আসতো না। এখন মাথা ফাঁকা পেয়ে একের পর এক ভাবনা আসছে। নানা রকমের এলোমেলো কথা মনে পড়ছে। মাঝে মাঝে সাদা চামড়ার মানুষদের কথাও মনে আসছে।

এখন ভাবছে সাদা চামড়ার মানুষরা কি খায়। শুকর, হরিণ যে খায় তাতো জানা আছে। কিন্তু আর কি খায়? রুপোর সাদা টাকা খায়। মানুষের হাড় গুঁড়ো করে খায়। অনেক দূরের দেশ থেকে এসে এতগুলো মানুষের প্রভু হয়ে বসা সহজ কথা নয়। সাদা

চামড়ার মানুষদের অনেক রকমের খাবার আছে। এর জন্য তাদের গায়ের চামড়া অমন সাদা। চোখ দুটো সব সময় নীল হয়ে থাকে।

অনেক দূরের দেশ থেকে সাদা চামড়ার মানুষরা এসেছে। তারা এখন সাওতাল পরগণা, সিংভূম, মানভূম, পুরুলিয়া আরো অনেক পাহাড়ের মালিক এদেশের জমি, চাষের ক্ষেত, জঙ্গল সব তাদের হয়ে গেছে—সত্যি? সে অবাক হয়ে যায় মাঠ, জমি, পাহাড়ের মালিক মানুষ হয় কি ভাবে। তুমি এ সব সৃষ্টি করনি, করতে পার না সব বোঙ্গাঠাকুর সৃষ্টি করেছেন।

বোঙ্গাঠাকুর প্রথম জল তৈরী করেছিলেন। তারপর মাটি। মাটি সমান হল না তখন তিনি মই দিয়ে মাটি সমান করলেন। মাটি সমান করে দিলেও অনেক জায়গা উঁচু থেকে গেল। উঁচু জমি হল পাহাড় তারপর বোঙ্গাঠাকুর 'বেনা'র' বীজ বুনে দিলেন—বেনার গাছ হল পরে দুর্বাঘাস গজিয়ে দিলেন। এবার তিনি একের পর এক গাছ সৃষ্টি করতে মন দিলেন—কডম গাছ, শাল গাছ, আসন গাছ, মউল গাছ। পর পর গাছ সৃজন করে 'জঙ্গল সৃজন' করলেন

চান্দো বোঙা সৃজন করা মাটির তিনি মালিক তোমরা মানুষ, হ্যাঁ, তোমাদের ব্যবহার করতে দিয়েছেন তোমাকে বাঁচতে হবে। বাঁচতে হলে খেতে হয় খেতে হলে জমিতে চাষ দিতে হয়। চাষ করে শস্যের দানা ঘরে তুলে নাও ঘরে বসে এবার আগুন জ্বেলে রান্না করে খাও তাই বলে তুমি জমির মালিক হয়ে যাবে কেন?

বোঙ্গাঠাকুর মানুষদের মালিকানা দিয়ে দেন নি। যতটুকু দরকার ততটুকু জমি চাষ কর। বনে অনেক রকমের জানোয়ার আছে দরকার হয় শিকার কর, তাই বলে বন উজাড় করে সব জানোয়ার শিকার করবে?

সাদা চামড়ার মানুষরা এসব বিধান মানে না। তাদের অনুগত হয়ে সমতলের মানুষরা প্রচলিত আর কোন নিয়ম মানছে না।

একের পর এক ক্ষেত তারা দখল করে নেয়। লাল নিশান পুঁতে দেয়—অমনি হয়ে গেল তাদের জমি। তুমি চাষ করলে তোমাকে ফসলের ভাগ দিতে হবে। ভাগ না দিতে পারলে তুমি কয়েদ হবে। এরপর দেনার দায়ে তোমার গরু, মোষ, মুরগী, লাঙ্গল, টাঙ্গী, ঝুড়ি সব তাদের হয়ে যাবে।

তাদের ক্ষেত, গরু, মোষগুলো নিয়ে নেবার জন্য কত রকমে নিয়ম জারি করে। পর পর কতগুলো নিয়মের কথা মনে এল—

হাড়িয়া তৈরী করতে হলে ট্যাক্সো দিতে হবে।

জোর করে খাসী নিয়ে যাচ্ছে।

দেওনরা জুলুম করে।

সমতলে ক্ষেত খামারীর কাজ করতে গেলে মাথা পিছু একটি রুপোর টাকা ধার্য হয়েছে।

'সেবক পাট্টায়' টিপ সই দিয়ে আজীবনের মত চাকর করে নিচ্ছে।

দেনা শোধ করতে না পারলে সব ফসল মহাজন কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে! রাস্তা তৈরী করার জন্য বেগারী দিতে বাধ্য করছে।

পর পর নিয়ম কানুনগুলো মনে আসাতে আবার তার বুকের রক্ত গরম হয়ে উঠলো। রাস্তা তৈরী তুমি করবে, হাতে কিছু পাবে না। রাস্তা তৈরী শেষ হলেই পাহাড়ের ওপরে উঠে আসছে সমতলের মানুষ। ওপরে উঠে এসে তাদের পেটের মধ্যে থাবা বসিয়ে দেয়। তোমাকে কত রকম দড়ি দিয়ে বাঁধবে তার হিসাব তুমি নিজেই করতে পারবে না। সব শেষে মহাজন বের করবে তোমার টিপ ছাপ দেওয়া খত খানা। ব্যাস, তোমার সব কিছু শেষ হয়ে গেল।

শনিয়ালাল এসেছিল নুন আর কাপড় নিয়ে। সবাই নুন আর কাপড় নিয়ে টিপ ছাপ দেগে দিল। তারপর বোঙ্গাঠাকুরের সব নিয়ম বাতিল হয়ে গেল। শুরু হল একের পর এক টিপ ছাপ। রুপোর টাকা এল।

শনিয়ালাল খতনার নেকড়ে হয়ে গেল। টিপ ছাপ দেখিয়ে একের পর এক জমি দখল নিতে শুরু করলো। সাদা চামড়ার মানুষরা তার সঙ্গে আছে। বাধা দিলে ধরে নিয়ে গিয়ে কয়েদ করে। একের পর মাঠ, খেতের জমি শনিয়ালালের হয়ে গেল। একটা মানুষ এত জমি আর ক্ষেত নিয়ে কি করবে বুঝতে পারে না সে। ভাবতে থাকলো কিন্তু কোন সমাধান খুঁজে পেল না। আপন মনে বিড় বিড় করে বললো. এক একটা মানুষের এত জমি, ক্ষেত আর গরু মোষ কোন্ কাজে লাগে।

কোন জবাব পাচ্ছে না। মাথার মধ্য থেকে প্রশ্নগুলো চলেও যাচ্ছে না। বার বার ঘুরে ঘুরে এক প্রশ্ন এসে তার সামনে দাঁড়াচ্ছে। প্রশ্নগুলো মাছির মত, সে ভাবলো। তুমি তাড়িয়ে দিতে চাইলেই তাড়িয়ে দিতে পারবে না। অদৃশ্য ডানা নাড়িয়ে হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে এসে তোমার মনের মধ্যে বসে পড়বে তারপর ডানা ফড় ফড় করে তোমাকে জ্বালিয়ে খাবে।

নয়তো এসব কথা ভাবছো কেন, সে নিজেকে নিজে জিজ্ঞাসা করলো। তুমি হলে পাহাড়ের একটা কালো মানুষ। নিজে চাষ করে ফসল ফলাও, জঙ্গল থেকে শিকার করে আন। এ দুটোর একটা না করতে পারলে তোমার পেট ফাঁকা হয়ে থাকে। জল খেয়ে পেট ভর্তি করে ক্ষুধার কথা ভুলে থাকতে হয়। তোমার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয় সাদা চামড়া আর সমতলের মানুষদের। তারা কোন কাজ করে না। গাদায় গাদায় জামা কাপড় পরে। হাতে ক্ষত নিয়ে ঘুড়ে বেড়ায়—তাদের কি কি লাগে তা তোমার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়।

এবার সে নিজেকে ভয়ানক অসহায় বলে মনে করলো। অমনি সে রেগে গেল। সে আর নিজের মত থাকতে পারছে না। ঘুম এলে এ সব বিরক্তিকর চিন্তা থেকে রেহাই পেতে পারতো।

বিরক্ত হয়ে গুহার সংকীর্ণ খোঁদল থেকে বাইরে বেরিয়ে এল।

মাথা গরম এবং সীসের মত ভারী। গুহার মুখের কাছে এসে বসলো।

নিচের দিকে চোখ যেতেই সে চমকে উঠলো। কয়েকটা বুনো মোষ জঙ্গলের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মাথায় ধারালো বাঁকা শিং। বাঁকা শিংয়ে চাঁদের আলো পড়েছে। খাড়ার মত ধারালো শিং গুলো ধার দেওয়া কাস্তের মত চিক্ চিক্ করছে। কার সাধ্য চোখ ফেরায়।

থমকে দাঁড়িয়ে আছে কেন? ওরা এমন একটা কিছু দেখেছে যা দেখতে চায়নি। মোষগুলোর সামনেই খোলা মাঠ। খোলা মাঠে তারা নামছে না। মাঠ পাড়ি দিয়ে চলে যাবার জন্য তারা এসেছিল। মাঠ পাড়ি দিতে পারলেই কেন্দু পাতার জঙ্গল। তারপরে শুরু হয়েছে আবার শাল, বহড়া গাছের জঙ্গল।

একটা মোষ নাক দিয়ে ভোঁস করে শব্দ করলো। এত জোরে শব্দ করলো যে গুহার মুখে বসে সে শুনতে পেল। পা দাপালো সবার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মোষটা। পরপর অন্য মোষগুলো এক সঙ্গে মাথা নিচু করে দাঁড়ালো।

তারা শিকারের সন্ধান পেলে এরকম প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ায় আক্রমণ করার জন্য। তখন তারা চোখে চোখে কথা বলে একে অপরকে নির্দেশ দেয়। হাতের বর্শা বাগিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। জানোয়ারটা নাগালের মধ্যে এলে বুকের ঠিক মাঝখানটায় বর্শার ফলা গেথে দেয়।

মোষগুলো তাদের শত্রুকে আক্রমণ করার জন্য এখন প্রস্তুত। কিন্তু কাকে আক্রমণ করবে তা বোঝা যাচ্ছে না। তার চোখ দুটি অনুসন্ধানে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো। এবার সে দেখতে পেল বাঘটাকে। বিশাল এক বাঘ শালের দীর্ঘ ছায়ায় একটা ঝোপের পাশে থাবা গেড়ে বসে আছে।

মোষগুলোর দাঁড়িয়ে থাকার কারণ বুঝতে পারলো। বাঘ নড়ছে

না। চোখ দুটো জ্বলছে ছায়ার অন্ধকারে।

সে কেঁপে উঠলো। হ্যাঁ, এত বড় বাঘ সে এর আগে দেখেনি।

জঙ্গলে নানা রকমের পশু আছে তা সবাই জানে। কিন্তু বাঘ হল স্বতন্ত্র। তার গায়ে যেমন জোর তেমনি সে চতুর। তার একটা হাঁকে জঙ্গল থর্ থর্ করে কেঁপে ওঠে। আর বুনো মোষ হল গোঁয়ার। কখন যে শিং বাঁকিয়ে তেড়ে আসবে বোঝা যায় না। একবার তাড়া করলে আর থামতে জানে না বিশাল মাংস পিণ্ড নিয়ে ধেয়ে চলছে তো চলেছেই।

হঠাৎ মোষগুলো দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেল। এবার তারা বাঘকে অক্রমণ করবে। অন্য কোন উপায় নেই মোষগুলোর। এবার সে নিজের ভেতর উত্তেজনা অনুভব করলো। মোষগুলো চক্রব্যূহ রচনা করেছে। এবার এক সঙ্গে আক্রমণ করবে। আসন্ন লড়াই দেখার জন্য সে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলো। নিজের বাস্তব অবস্থা ভুলে গেল।

গুহার মুখে সে বসে আছে। শরীরের রক্ত এখন চঞ্চল। নিচের উপত্যকা একটা যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। দুই শত্রু এখন মুখোমুখি। কে আগে আক্রমণ করবে তার ওপর নির্ভর করবে যুদ্ধের ফলাফল। বস্তির বৃদ্ধরা সবসময় আগে আক্রমণ করার পরামর্শ দেয়। বনের পশু শিকার করতে গিয়ে তার অসতর্ক মুহূর্ত খুঁজে নিয়ে আক্রমণ চালাতে হয়।

মানুষের সঙ্গে যুদ্ধে নিয়ম বদলে যায়। নিরস্ত্র মানুষকে আক্রমণ যে করে সে কাপুরুষ। সমাজ তাকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে। পশু সমাজে আক্রমণের কোন নিয়ম নেই। সাদা চামড়ার মানুষরা কোন নিয়ম মানে না। নিরস্ত্র সাঁওতালদের তারা অবলীলায় গুলি করে। মরদরা যখন ক্ষেতে কাজ করে, গরু মোষ নিয়ে পাহাড়ের কাছে চড়াতে যায় তখন জমিদার বস্তিতে আগুন লাগিয়ে দেয়।

আকাশে চাঁদ এখন আরো ওপরে। মোষগুলো চক্রব্যূহ তৈরী করে দাঁড়িয়ে আছে। বাঘ চুপচাপ বসে আছে। উভয় পক্ষ অপেক্ষা

করছে নির্ভরযোগ্য সময়ের জন্য।

বাঘটা সম্মুখ সমরে নামলো না। কেন্দু বনের মধ্যে চট করে ঢুকে গেল। হয়তো অন্য কোন ফিকির তার মাথায় এসেছে। এখন আড়ালে আড়ালে অনুসরণ করবে। সময় বুঝে একটা মোষের ঘাড়ে চেপে তাকে দল থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে।

মোষগুলো খানিক সময় দাঁড়িয়ে রইল। তার পর আবার পা চালালো। অন্ধকারে তারা হারিয়ে যেতে গুহার মুখের কাছ থেকে সে সরে গেল। লগুড়খানা একবার মুঠোর মধ্যে চেপে ধরলো। অমনি তার ভিতর থেকে সাহস হারিয়ে গেল। জঙ্গলের মধ্যে এই সব জানোয়ারের সামনে একটা লগুড় হাতে নিয়ে দাঁড়ানো যায় না।

পরমুহূর্তে তার মনের ভাব বদলে গেল। আমাকে লগুড় হাতে নিয়ে দাঁড়াতে হবে, সে ভাবলো: দাঁড়াবার সাহস তার বুকের মধ্য থেকে যেন উঠে এল। আবার সাহস ফিরে এল।

মনে মনে বললো, রুখে দাঁড়াতে হয়। তারপর তুমি হেরে যেতে পার। একজন না একজনকে হেরে যেতে হয়। একজন জেতে অন্যজন হারে—এই হল নিয়ম। সাঁওতাল মুণ্ডা, চুয়াররা প্রতিরোধ করতে চেয়েছে। তীর নিয়ে শাল গাছের আড়ালে শাল গাছ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গুলির মুখে পাহাড় রক্তে লাল হয়ে গেছে। সব শেষে তারা হার মেনেছে।

এখানেই সব শেষ নয়। শেষের পর আর একটা আরম্ভ থাকে। সেই আরম্ভ আর হল না। সাঁওতালরা কুকুরের মত বশীভূত হয়ে গেল।

কুকুরের মত বশীভূত হয়ে কি হল?

জঙ্গল থেকে টুক্কুকে ধরে আনলো সাদা চামরার মানুষরা। দুটো হাত কেটে দিল। এখন টুক্কু কুকুরের মত হাটু ভেঙ্গে মাথা নিচু করে চেটে চেটে দাকা (ভাত) খায়। টুক্কুর খাবার দৃশ্য চোখের উপর ভেসে উঠতেই সে চোখ বন্ধ করলো। তবু একের

পর এক দৃশ্য মনে এল। তাম্রজুড়িতে চারজন সাওঁতালকে সাদা চামড়ার মানুষরা গুলি করে মেরে ফেলেছে।

তালিবনের দু'জন সাঁওতালকে ধরে দড়ি বেঁধে নিয়ে গেছে। তারা আর ফিরে আসেনি।

মাগুকে একটা গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখেছে দু'দিন।

করজুর পিঠে কয়েক কুড়ি দাগ দেগে দিয়েছে চাবুক মেরে মেরে। সে আর সোজা হয়ে হাঁটতে পারে না।

আলো ফুটলো, রোদে ঝলমল করে উঠলো আকাশ। সে গুহা থেকে নিচে নামলো না। গুহার মুখ থেকে বাঘের মড়ি দেখা যাচ্ছে। বাঘটা একটা মোষকে ঘায়েল করতে পেরেছে। মোষটা ছিল বোধহয় সবার পিছনে।

মোষের দেহ জঙ্গলের মধ্যে পড়ে আছে। পেছন দিক থেকে খানিকটা মাংস খেয়ে নিয়েছে। পেট ভরে যাওয়াতে মড়ি ফেলে রেখে সরে গেছে।

বেশি দূরে যায়নি। কাছাকাছি কোন গাছের ছায়ায় টান টান হয়ে শুয়ে আছে সাদা চামড়ার মানুষদের মত। এখন ঘুমোচ্ছে। কয়েকটা শকুন এসে গাছের ডালে চুপচাপ বসে আছে, নিচে নামতে ভরসা পাচ্ছে না। হয়তো মড়ির পিছনের কাঁটা ঝোপের নিচে শুয়ে বাঘ মড়ি পাহাড়া দিচ্ছে। নয়তো শকুনগুলো মাটিতে নেমে এতক্ষণে মড়ি নিয়ে টানাটানি শুরু করে দিত।

নিচে নামবার কথা এখন আর ভারতে পারছে না। গুহার আশ্রয়ে যে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা ছিল তা আর রইল না। এখন অন্য কোন নিরাপদ আশ্রয়ের কথা তাকে ভাবতে হচ্ছে। বুনো মোষের চলার পথে এসে পড়েছে। আর এখানেই আছে বাঘের আশ্রয়। গুহার মুখ যথেষ্ট চওড়া। বিশাল বাঘটা যদি তার গায়ের গন্ধ পায়?

বিশাল দেহ নিয়ে ওপরে ওঠা তার পক্ষে কঠিন হবে না। খোকা

বাঘের মত নিচের চাতালে বসে ভাববে না লাফ দেবে কিনা। চাতাল থেকে সে এক লাফে ওপরে উঠে আসবে। তারপর কি ঘটবে তা আর ভাবতে চাইছে না।

গুহার শেষ প্রান্তে একটা গর্ত এতক্ষণে তার নজরে এল। গর্তের মুখে কতগুলো পাথর পড়ে থাকতে সে দেখতে পায়নি।

এবার সে গর্তের মুখ থেকে পাথর সরাতে শুরু করলো। পাথরের চাইগুলো নেহাত ছোট নয়। একটা মানুষ চেষ্টা করলে সরাতে পারে। ফোলা পায়ের জন্য তার নানা রকমের অসুবিধা হচ্ছে। তবুও তাকে পাথর সরাতে হবে। আপাতত সে অন্য কোথাও চলে যেতে পারছে না। পা এখন শালগাছের গুঁড়ির মত মোটা। মালাই চাকীটা ডানের দিকে সরে গিয়ে একটা কুঁজের মত ফুলে আছে।

গর্তের মুখ পরিষ্কার হল। এমন গর্ত যে একটা মানুষ কাত হয়ে ভিতরে ঢুকে যেতে পারে। ভিতরে যদি বড় জায়গা থাকে তবে তার আবাস স্থল হবে অনেক নিরাপদ।

গর্তের মুখ পরিষ্কার হতেই সে মাথা গলিয়ে দিল। বুক গলে যেতেই মাথা শূন্যে ঝুলে গেল। এবার সে হাতে মাটি পেল। সাবধানে ফোলা পা টেনে নিয়ে নিচে নেমে গেল।

গুহার ভিতরে আর একটা গুহা। অন্ধকার। ধীরে ধীরে চোখে আলো ফুটে উঠলো। দেখতে পেল গুহার ভিতর। বড় গুহা। একখানা ঘরের মত। চারজন মানুষ লম্বা হয়ে শুয়ে থাকতে পারে।

গুহার মুখ সংকীর্ণ। ভিতরে একবার ঢুকতে পারলে নিরাপদ আশ্রয়। এমন নিরাপদ আশ্রয় সে আশা করেনি। এই ফোলা পা নিয়ে কোথাও যাবার আর কোন উপায় নেই। পাখানা তার ক্রমশই ফুলছে। যন্ত্রণা এখন সহ্য করতে করতে অনেক সহনীয় হয়ে পড়েছে। পাখানা যে আরো ফুলবে তাতে আর সন্দেহ নেই। বিশাল বাঘটা তাকে জানিয়ে দিয়েছে গুহার আশ্রয় নিরাপদ ছিল না। এখন সে

নিরাপদ আশ্রয়ে। শেয়াল ছাড়া অন্য কোন জন্তুর গুহার গহ্বরে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। তার হাতে একটা লগুড় আছে। হাত দু' খানা যখন আছে তখন কায়দা মাফিক লগুড় চালাতে পারবে।

তার চোখ দুটি ঝাপসা হয়ে এল। গাল বেয়ে চোখের জল নেমে আসছে। চোখ পুছবার কথা মনে এল না।

আবার সে বাইরে বেরিয়ে এল। মনে পড়লো মাংসের কথা। চাকা চাকা করে কেটে রাখা মাংস কালো হয়ে আছে। এবার পচে যাবে। রোদে মাংস শুকিয়ে নেবার কথা ভেবেছিল। শুকনো মাংস মন্দ নয়। শকুন দেখে আর সে চেষ্টা করে নি। খোকা বাঘের দেহ ইতিমধ্যে কোন জানোয়ার টেনে নিয়ে গেছে।

সে জমানো মাংস খেয়ে নেবার কথা ভাবছে। জমা যদি রাখতে হয় তবে পেটের মধ্যে রাখতে হবে। সে এবার খেতে শুরু করলো। ভয়ানক বিস্বাদ। কিন্তু কোন উপায় নেই। এই সঞ্চয়টুকু এখন তার একমাত্র ভরসা। বাঘটা সরে না গেলে সে নিচে নামতে পারবে না। মরি শেষ না করে বাঘটা নড়বে না।

অনিশ্চিৎ ভবিষৎ সামনে নিয়ে সে বসে থাকলো অনেক সময়।

এক সময় ক্লান্ত হয়ে পড়লো। এই নীরবতা আর নিঃসঙ্গতা তার বুকের উপর চেপে বসে আছে। একটা কিছু করা দরকার, কিন্তু কি যে করবে তাই বুঝতে পারছে না। ভিতরের মানুষটা এখন ভিতরে বসে আছে। বাইরে এসে তার সামনে অথবা পাশে বসে থাকতে পারছে না। সে আছে ছায়ার মধ্যে। যদি খোলা আকাশের নিচে গিয়ে বসতে পারতো ভিতরের মানুষটাকে ফিরে পেতে পারতো।

সে কথা বলতে পারছে না। মানুষকে কাজ করতে হয়। কাজ না থাকলে মানুষ কথা বলে সময়ের শূন্যতাকে ভরাট করে রাখে। বস্তির বুড়োবুড়ীরা কাজ করে না তাই তারা কথা বলে।

সুযোগ পেলে কত রকমের গল্প বলে। সে সব গল্পের মধ্যে থাকে অতীতের কত কথা।

তারা তাদের অতীতের কাহিনী বসে থাকা বুড়োবুড়ীদের কাছ থেকে শুনে জেনে নিয়েছে।

এক সময় তারা 'খোজকামান' দেশে থাকতো। সেখানে থাকার সময় তাদের পিতৃপুরুষরা অনেক খারাপ কাজ করেছিল। সমাজের নিয়মগুলো আর মানছিল না। বোঙাঠাকুর রেগে গিয়ে তাদের জলের তলায় তলিয়ে দিল। একমাত্র 'পিলচু হারাম' আর 'পিলচু বুড়ী' বেঁচে ছিল তাদের আবার অনেক 'হোপন কুড়ি' হল। সমাজ আবার বড় হল। তখন তারা বাস করতো 'হিহিড়ি পিপড়ি'তে। তারপর তারা গেল 'জরিপ দেশে'। 'জরিপ দেশ' থেকে 'সিংতুয়ার' আর 'বাই তুয়ার' দিয়ে অনেক পথ তাদের হাঁটতে হল। শেষে তারা আবার বস্তি বসালো 'কায়েঙ্গে' ও 'চারচম্পায়'।

বুড়োবুড়ী অনেক কথা না বললে এসব কথা তারা জানতে পারতো না।

বুড়োবুড়ীদের মত তার এখন কথা বলতে ইচ্ছে করছে। কতদিন হল সে কথা বলেনি। কথা বলতে না পারার তুঃখে তার বুক ভারি হয়ে উঠলো। কার সঙ্গে এখন সে কথা বলবে?

তার সামনে গুহার মুখ। গুহার মুখ আলোয় আলোকিত। ওপর থেকে একটা আকুচি লতা ঝুলে আছে। পাতাগুলো রোদের আলোতে চক্‌চক্ করছে।

এবার সে কথা বলতে শুরু করলো। সবুজ পাতায় চোখ রেখে বললো, আমরা ভালই ছিলাম। তারপর ওরা এল সমতল থেকে। রাস্তা তৈরী হল। এত দিনের সমাজ ওলট পালট হয়ে গেল। আমরা হলাম দাস, হুকুমের চাকর।

জমির মালিক হল জমিদার। জমিদারের আছে পাইক, বরকন্দাজ। তাদের সঙ্গে আছে পুলিশ, দারোগা। তাদের পিছনে

সাদা চামড়ার মানুষ।

মানুষগুলি অদ্ভুত। মুখে এক কথা।

মাঝি তুর ক্ষেতের ধানটো দে।

তুর ক্ষেতের মকাই নিয়ে নিলাম।

তুর গরু মোষ আমার হয়ে গেল।

এত এত নিয়ে ওরা কি করে? একটা মানুষের কি কি লাগে?

উত্তরাই থেকে হাওয়া উঠে এল। আকুচি পাতা দোল খেল। পাতা দোল খাওয়াতে সে খুসি হল। বললো, তুই আমার কথা বুঝতে পারলি। কিন্তু মহাজন আঁর বেনিয়ারা আমাদের কথা বুঝতে পারে না। দারোগা পুলিশ সাঁওতালদের জানের কোন মূল্য দেয় না। মহাজন, জমিদার নানা ফিকিরে সাঁওতালদের বেগার খাটতে বাধ্য করে। সাদা চামড়ার মানুষরা চাবুক নিয়ে ঘোড়ার পিঠে ঘুরে বেড়ায়। এত সব কাণ্ড করে, হাজার হাজার মানুষের বুকের ওপর চেপে বসে থেকে ঐ মানুষগুলি কোন সুখ পায়?

ধর, এই পাহাড়টার আমি মালিক হয়ে গেলাম। হ্যাঁ, মালিক। ঐ সমতলের সবুজ মাঠখানা আমার হয়ে গেল। দূরের জঙ্গল আমার। সব নিয়ে নিলাম। তাতে কি হল? জবাব দে।

বল, আমার হল কিনা। যদি না হয় তাতেও বা ক্ষতি কি। এত জমি দিয়ে কি করবো আমি? আমার চাই ঐ ছোট মাঠ খানা। লাঙ্গল দিয়ে চষে মকাই বুনবো। সারা বছর ধরে মকাই খেতে পারবো। জঙ্গলে শিকার আছে শিকার করবো। পুকুরে জল আছে। আচ্ছা বল, আর কি কি লাগতে পারে? এই পাহাড়, অত জমি কোন কাজে লাগবে আমার?

হ্যাঁ, আমার জলের পাত্র চাই। পুকুর থেকে জল তুলে আনবো। একখানা লাঙ্গল আর দুটো গরু চাই। তার দরকার হবে মাটির হাঁড়ি। বাটি গামলাও চাই। কাস্তে একখানা দরকার। আরো কিছু চাই। সে একটু সময় ভাবলো।

কি কি তার চাই, তাই সে এখন ভাবছে। তখন টাঙ্গীর কথা মনে এল। গোয়াল ঘরের কথা ভুলে ছিল দেখে আশ্চর্য হল। হ্যাঁ, গোয়াল ঘর চাই। গোয়াল ঘর দড়ির কথা মনে করিয়ে দিল। সে বললো, আমার দড়ি চাই। দড়ি ঘাস দিয়ে তৈরী করে নেবে। তারপর আর কি চাই? না, এরপর চাওয়ার আর কি থাকতে পারে? হয়তো আরো কিছু চাইবার আছে সে জানে না ঠাকুরা জানে। তাদের চেয়ে বেশি জানে সাদা চামরার মানুষরা। ঠাকুরা সাদা চামরার মানুষদের মত হতে চায়। সাদা চামরার মানুষরা থামতে জানে না।

কিন্তু নিজের জন্য আর চাইবার মত কিছু খুঁজে পেল না। তার কথা বন্ধ হল। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়লো লাল ঠোঁটের কালো পাখীর কথা তার জানু সন্ধী থেকে নিচের দিকে ঝুলে আছে। এখন লাল ঠোঁটের কালো পাখীটা ঘুমিযে আছে। সে উলঙ্গ বলে কালো পাখীটাকে দেখতে পাচ্ছে - কত ছোট হয়ে আছে!

যখন লাল ঠোঁটের কালো পাখী ক্ষেপে যায়—তখন শয়তান লিঠার কথা মনে এল এবার সে বুঝলো, লাল ঠোঁটের কালো পাখীটাকে আড়াল দিয়ে রেখে দেওয়া দরকার। ও তার সব কথা শুনে চলবে তা হবে না। হাত, পা এরাতো একটা মানুষের মর্জির ওপর নির্ভর করে চলে। তুমি যা বলবে তাই করবে। কিন্তু লাল ঠোঁটের কালো পাখীটা অন্য রকম। সে তোমার সব কথা শুনবে এমন নাও হতে পারে। সে আছে তোমার শরীর থেকে ঝুলে কিন্তু সম্পূর্ণ তোমার নয়। তার নিজের কতগুলো মর্জি আছে তখন আর কোন কথা শুনতে চায় না। ডানা ঝাপটিয়ে—সারা শরীরে আগুন ছড়িয়ে দেয়।

এই পাখী, ঘুমিয়ে থাক।

সে শালা, কথা শুনবে না। পাখা সাপটাবে। এবার তার কাপড়ের কথা মনে এল। কাপড় আর গামছা চাই।

তার উলঙ্গ শরীরের কথা ভেবে সে লজ্জা পেল।

আবার গুহার ভিতর দিকে ঢুকলো। এখন গুহার মধ্যে নরম আলো। গুহার ছাদের কাছাকাছি একটা ফোঁকর আছে। ফোঁকর একেবারে ছোট নয়—একটা মানুষ গলে যেতে পারে। ঐ ফোঁকরটা হল গুহার মধ্যে ঢোকার আর একটা পথ।

ফোঁকর থেকে আলো আসছে। সেই আলো তাকে এবার অদৃশ্য হাতে ডাকছে। ফোঁকরের কাছে গেল। বুক সমান উঁচু ফোঁকর। ফোঁকরের নিচে একখানা পাথর দাঁড় করিয়ে রাখা আছে। পাথরের ওপর পা রেখে ফোঁকরের মধ্যে উঠে যাওয়া যায়। কোন একজন মানুষ এই পাথরখানা সাজিয়ে রেখেছে, সে ভাবলো। ফোঁকরের মধ্যে ওঠার জন্য পাথরখানা রাখা দরকার। তার আগে কোন একজন মানুষ গুহার মধ্যে ছিল বিশ্বাস তার দৃঢ় হল। সে রোমাঞ্চ অনুভব করলো অদেখা মানুষের অস্তিত্ব কল্পনা করে।

পাথরের ওপর উঠে দাঁড়ানো এক কঠিন সাধ্য কাজ। অবশ্য কঠিন কাজ তাকে করতেই হয়। সামনে এগোতে ফোলা পা অসম্ভব এক অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। লগুড় দিয়ে সে একটা পায়ের কাজ করে। গুহার মধ্যে লগুড় খাড়া হয়ে দাঁড়াচ্ছে না, ছাদে আটকে যাচ্ছে। কাত হয়ে লগুড়ের ওপর ভার রেখে তাকে উঠে দাঁড়াতে হবে।

পাথরের ওপর উঠে দাঁড়াতে পারলো। ফোঁকর থেকে গুহার বাইরের দৃশ্য দেখতে পেল। নিচে বিশাল বিশাল কালো পাথর দাঁড়িয়ে আছে। পাথরগুলো থালার মত পাতলা কোনটা মোটা। কে যেন বিশাল বিশাল এবড়োখেবড়ো থালা এলোমেলো করে ফেলে রেখেছে।

ফোঁকর থেকে জলাভূমি স্পষ্ট দেখা গেল। জলাভূমি এখন অনেক কাছে। পাহাড়ের গা থেকে শুরু হয়েছে সমতলভূমি। ঘাস গজিয়ে সবুজ। মাঠের বুকে কয়েকটা গাছ। এ রকম মাঠে তারা

গরু মোষ চড়ায়। সে এখন বস্তির গরু মোষ চড়াবার মাঠের সামনে যেন দাঁড়িয়ে আছে।

জলাভূমি এত কাছে দেখে মন তার আনন্দে ভরে গেল। এবার সে ফোঁকরটার মধ্যে উঠে বসলো। ফোলা পা একটু অসুবিধা করছিল। সে গ্রাহ্য করলো না। পা বাঁকা করতে পারলে বসা অনেক সহজ হত। ফোলা পা বাঁকা হবেনা বলে তাকে প্রথমে গুহার মধ্যে ঝুলিয়ে রাখলো। পায়ের মধ্যে ঝন্ ঝন্ করছে বলে বিরক্ত হয়ে তাকেও টেনে তুললো। ফোলা পাখানাকে কুৎসিৎ ভাষায় গালি দিল। গালি দিয়ে ফোঁকর থেকে নিচে নামলো। ফোলা পা-খানাকে শাস্তি দিতেই যেন ফোঁকর থেকে নিচে নেমে এল। নামলো এবার বাইরে।

নিচে নেমে দেখতে পেল আর একটা ছোট গুহা। তার ডান দিকে পাথর ফেটে হাঁ হয়ে আছে। ওপরের দিক খোলা—ছাদ হীন একটা গুহা। সে ওপরে উঠে এল গুহার কাছে। থমকে দাঁড়ালো। নিজের চোখ দুটোকে বিশ্বাস করবে কিনা বুঝতে পারছে না। একটা মানুষের কঙ্কাল কাত হয়ে আছে। পায়ের গাঁট দুটো মাটির মধ্যে এখনো গেঁথে আছে। বুকের খাঁচা ভেঙ্গে এক পাশে পড়ে আছে। মাথাটা নেই। হাড়গুলো দীর্ঘদিন ধরে রোদবৃষ্টি খেয়ে কালচে বাদামী হয়ে আছে।

সে তার নিজের পরিণতির সামনে বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো।

দিন শেষ হয়ে রাত নামলো। একটানা ঘুমিয়ে নিল সে। কোন ভাবনা তার মাথায় আর নেই। গুহার ভিতরে সে যথেষ্ট নিরাপদ। বাইরে মৃত্যু যে থাবা উঠি.য় আছে তাতো জানাই আছে।

সকাল হতে সে বসলো নিজেকে প্রস্তুত করে নিতে। যেখানে যেমন তাকে তাই মেনে নিতে হবে। পাহাড়ের নিচে একটা ময়ুর ডাকছে। নামতে পারলে হয়তো শিকার করতে পারতো। সে

তীর ধনুকহীন। বৃথা চেষ্টা করে কোন লাভ নেই। অকারণে ফোলা পাখানাকে আবার আর একবার চোট দেওয়া হবে। এখন পা পাথরের মত ভারি হয়ে আছে, আর নামতেই পারছে না।

এখন ডালের মাথায় একখানা পাথর বাঁধছে। বাঁধা শেষ করে দেখে নিল। বর্শা হল কিনা বুঝে নিতে চাইছে। পাথরের ফলা সে গুহার মধ্যে পেয়েছে। ফলা অবিকল বর্শার ফলার মত। ডালের মাথায় লতা দিয়ে বাঁধতে একখানা বর্শা হয়ে গেল। এখন সে পরখ করছে আপন হাতে তৈরী বর্শার কার্যকারিতা।

বর্শা, টাঙ্গী তারা নিজেরাই তৈরী করে। অবশ্য ফলা তারা নিজেরা আর তৈরী করে না। লোহার কারিগর আগুনে লোহা তাতিয়ে হাতুড়ী পিটিয়ে তৈরী করে দেয়। তারা মকাই, যব, ভুট্টা দিয়ে নিয়ে আসে। বাট তৈরী করে তার মাথায় বর্শার ফলা লাগিয়ে নেয়। পাথরে ঘষে ঘষে ধার তুলে নিত।

অবশ্য এখন অন্যরকম নিয়ম হয়েছে। সাদা চামড়ার মানুষরা এসে বসাতে ফসল দিয়ে এ সব আর পাওয়া যায় না, টাকা দিয়ে বর্শার বা টাঙ্গীর ফলা কিনতে হয়। সেই টাকা পেতে সাঁওতালরা মহাজনের কাছে যায়। কাগজে টিপ ছাপ দিয়ে টাকা পায়।

অনেকে হাটে গিয়ে ফসল বেচে টাকা আনে। বেনিয়ারা সব সমতলের মানুষ। তারা রুপোর টাকা নিয়ে যব, মকাই, সর্ষে—তাদের ফলানো ফসল কিনে নেয়। নানা রকম ভঞ্চকতা করে সাঁওতালদের ঠকায়। জটিল হিসাবের মুখোমুখি হয়ে তাল হারিয়ে ফেলে। তারা যে ঠকে যাচ্ছে বুঝতে পেরেও কিছু করতে পারে না। হাতে টাকা পাবার জন্য অনেক অন্যায় জুলুম আর প্রতারণা মেনে নিতে বাধ্য হয়।

এই শালার রুপোর টাকা, সে বিরক্তির সঙ্গে বললো। এক ডেলা থুথু ফেলে আবার নিজ হাতে তৈরী বর্শার দিকে মনযোগ দিল। হ্যাঁ, বর্শার মত একখানা বর্শা হয়েছে। এখন এই বর্শা নিয়ে শিকার করার চেষ্টা করতে হবে। শিকারে সাফল্য মানে হল হাতের মুঠোয় খাবার।

খাবার পেলে কলজের জোর ঠিক থাকে।

বাঘের ভয় অনেকটা কমে গেল। তবু সে নিচে নামলো না। মড়ি যতক্ষণ শেষ না হবে নিচে নামা যাবে না। ক্ষুধা তৃষ্ণার কথা ভেবে কোন লাভ নেই জন্ম থেকে এই ক্ষুধা আর তৃষ্ণা মানুষের সঙ্গে থাকে। তাই বলে বেসামাল হয়ে পড়লে চলবে না। আগামী দিনগুলি সহজ সরল ভাবে আর আসবে না সে মেনে নিয়েছে অজানা ভবিষ্যৎকে। শিকার করতে হলে নিচে নামতে হবে—আজ না হয় কাল। তৃষ্ণাও পেয়েছে। তৃষ্ণা পেলেই নিচে নেমে যাবে তা আর হবে না। অপেক্ষা তাকে করতেই হবে। জঙ্গলের জীবন হল ধৈর্য্য আর প্রতীক্ষার জীবন।

আবার সে ঝুলন্ত লতার পানে তাকালো। বলতে ইচ্ছে হল, যদি ধৈর্য্য হারাও তোমাকে শিকার হয়ে যেতে হবে। যদি তুমি বুক্ষ তৃষ্ণা নিজের চেয়ে বড় বলে ভাব তোমাকে মরতে হবে।

এ সব কথা ভাবলো কিন্তু বলার সুযোগ পেল না। তার আগেই দেখতে পেল বনমুরগীটাকে। দু টো বাচ্চা নিয়ে পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে আছে দৃপ্ত ভঙ্গিতে। ঘাড় উঁচু করে নিচের দিকে কি যেন দেখছে। বাচ্চা দুটি মায়ের পিছনে দাঁড়িয়ে ডানে বাঁয়ে ঘাড় দোলাচ্ছে।

তার চোখ জ্বলে উঠলো। হাতের কাছে এমন খাবার আশা করে নি। বনমোরগের মাংসের স্বাদ আলাদা। খাবার মত মাংস।

আর অপেক্ষা করলো না। যে কোন মুহূর্তে মোরগটা নিচে নেমে যেতে পারে। এখন সে নাগালের মধ্যে। সে তড়িৎ হাতে বর্শা তুলে নিল। লক্ষ্য স্থির হতেই বর্শা ছিটকে গেল বনমোরগের দিকে। অব্যর্থ তার হাতের নিশানা। পেটের মধ্যে বর্শা গেঁথে গেল।

বনমোরগ কয়েকবার পাখা সাপটালো। পাথর বেয়ে পালিয়ে যেতে চেয়েছিল। পালাবার আর কোন উপায় ছিল না। শরীর কাত হয়ে গেল। গড়িয়ে পড়ে গেল নিচে। আবার কয়েকবার পাখা সাপটালো। পা টান টান করে দিয়ে শুয়ে পড়তে বাধ্য হল।

মুরগীর বাচ্চা দুটো ভয় পেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো নিচের জঙ্গলে। বন আবার নিস্তব্ধ হল। একটা বনমুরগীর মৃত্যু কোন পরিবর্তন আনতে পারলো না।

সে অবাক হল পাথরের ফলা বসিয়ে তৈরী করা বর্শার কার্যকরী ক্ষমতা দেখে। খোকা বাঘটাকে শিকার করেছিল বড় এক খণ্ড পাথর মেরে। বাঘ পাথরের ধাক্কা সামলাতে না পেরে নিচের পাথরে উল্টে পড়তে গিয়ে লাফ দিয়েছিল। তার হিসেবে গণ্ডগোল হয়ে গেল বলে গুহার মুখের কাছে আসতে পারেনি। গুহার নিচের পাথরে লেগে চাঁদি ফেটে দু' ফাঁক হয়ে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গিয়েছিল। এবারকার ঘটনা সম্পূর্ণ অন্যরকম। পাথরের ফলায় মুরগী এফোড় ওফোড় হয়ে গেছে। খরগোশ, ময়ূর, শেয়াল শিকার করা এখন সহজ হয়ে গেল।

এক টুকরো পাথর দিয়ে সে বাঘের ছাল ছাড়িয়ে নিতে পেরেছে। খোকা বাঘের ছালখানা গুহার মুখে চিত হয়ে শুয়ে আছে রোদ খাবার জন্য। এ রকম আশ্চর্য হবার মত ঘটনা হয়তো আরো দু'চারটে ঘটবে। তারপর ?

এই ফোলা পা নিয়ে ইচ্ছে মত কোন ঘটনা ঘটানো এখন যে অসম্ভব তাতো বুঝতে পারছে। শয়তান কিঠা ফোলা পায়ের মধ্যে ঢুকে বসে আছে। ও বেড়িয়ে যাবে না। তাকে শেষ করে দিয়ে তবে বিদায় নেবে। বনমুরগী শিকার করতে পেরেও সাফল্যের আনন্দ নিজের ভিতর অনুভব করতে পারছে না।

নিচে নেমে গেল। মুরগীর ঠ্যাং দুটো ধরে ঝুলিয়ে নিল। ওপরে উঠে মুরগীটাকে শুইয়ে দিল গুহার মুখে। ফোলা পাখানা টান্ টান্ করে শুইয়ে দিয়ে বসলো মুরগীর পাশে।

বর্শা টেনে বের করে আনতেই রক্ত বেরিয়ে এল। অমনি তার বুকের মধ্যের তৃষ্ণা উঠে এল গলায়। মুরগীর উষ্ণ রক্তে মুখ লাগিয়ে পান করতে শুরু করলো। গরম রক্ত গলা বেয়ে নিচের দিকে নামছে। যত রক্ত নামছে তত গলা ভিজছে। যত গলা ভিজছে তত

রক্ত পানের ইচ্ছা তীব্র হয়ে উঠছে। সে ক্ষুধার্তের মত উষ্ণ রক্ত পান করছে।

গলা ভিজে গেলে মুরগী নিচে নামিয়ে রাখলো। এখন তার হো হো করে হাসতে ইচ্ছে করছে। ফোলা পায়ের কথা আর মনে নেই। কতদিন বাদে সে টাটকা রক্ত পান করার সুযোগ পেল।

তারা জঙ্গলে না গেলে রক্ত পান করে না। যেখানে যে নিয়ম তা তো একটা মানুষকে পালন করতেই হয়। বস্তিতে মাঝি আছে। সে যা বলে তা মেনে চলতে হয়—এই হল নিয়ম। সে নিয়ম তোমাকে মানতে হবে। তুমি মানুষ—মানুষের জন্য বোঙ্গা ঠাকুর কতগুলো নিয়ম বলে দিয়েছেন; সে সব নিয়মের কথা তোমাকে মেনে চলতেই হবে—নয়তো সমাজ থাকে না।

গাঁও বুড়োরা নিয়মপদ্ধতিগুলো জানে। তারা নিয়ম পদ্ধতি-গুলো জেনেছে পিতৃ পুরুষদের কাছ থেকে। নিয়মপদ্ধতির কোন অদল বদল হয় না; কিন্তু কখনো কখনো অন্যরকম পরিস্থিতি আসে। তখন গাঁও বুড়োরা বিপদে পড়ে। পুরনো নিয়মপদ্ধতি অচল হয়ে যায়—দরকার নতুন নিয়মপদ্ধতি। গাঁও বুড়োরা নতুন নিয়মপদ্ধতি দিতে পারে না। কারো কিছু বলার থাকে না। হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। বুড়ো মাঝি অসহায় হয়ে মাথা ঝাঁকায় আর বলে, হাপে-হাপে তু বুল।

তখন সমাজে আবির্ভূত হয় কিলাঁর।

পাশে চোখ ফেলতেই আবার তাকে দেখতে পেল। তার ভিতরের মানুষটা আবার বাইরে বেরিয়ে এসেছে। সে রোদের মধ্যে বসে আছে। তার পাশে বসে আছে ভিতরের মানুষটা, তার হাতে একটা মুরগী ঝুলছে।

তুই একটা মুরগী শিকার করলি, সে বললো পাশে বসে থাকা তার ভিতরকার মানুষটাকে। অমনি হাসি এসে গেল তার। হো

হো করে হাসতে গিয়ে থমকে গেল।

উপত্যকার দিকে চোখ যেতে তার চোয়াল ফাঁক হয়ে গেল। হাঁ করে তাকিয়ে রইল। চোয়াল বন্ধ করার কথা ভুলে গেল।

মানুষ। কয়েকজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে উপত্যকার মুখে। সে সংখ্যা গণনা করতে জানে না বলে গুণতে পারছে না। গুণতে জানলে পঁচিশ জনের ওপর মানুষ হত। দু'জনের পিঠে ঝুলে আছে বন্দুক। বেশির ভাগ মানুষের হাতে বর্শা। অনেকে ধুতি মালকোচা করে পরা। অনেকের গায়ে জামা আছে। তারা হাত নেড়ে নেড়ে একে অপরকে কি যেন বলছে।

তারা এসেছে খনিজ ধাতুর সন্ধানে। সঙ্গে কয়েকজন সাদা চামড়ার মানুষ আছে। তারা একটা তাঁবু খাটিয়ে তার নিচে বসে আছে। গাছের আড়ালে বলে গুহা থেকে তাদের দেখা যাচ্ছে না। সঙ্গের দিশী কুলীরা অপর পাশে এসেছে রান্না করছে খাবার জন্য। তাদের রক্ষা করার জন্য কয়েকজন দিশী গোলন্দাজ আছে তাদের সঙ্গে।

এ সব কথা গুহার মুখে বসে থাকা মানুষটার পক্ষে জানা সম্ভব নয়। সে অবাক চোখে তাকিয়ে রইল। গভীর জঙ্গলে মানুষ দেখে নিজের চোখ দুটিকে আর বিশ্বাস করতে পারছে না। কতগুলো মানুষ যেন উড়ে এসে বসে পড়েছে গভীর বনের মধ্যে। এবার তাকালো বাঘের মড়ির দিকে। দেখতে পেল না বাঘের জ্বল জ্বলে হলুদ চামড়া। মারী মুখে তুলে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে চলে গেছে।

বাঘ ভয় পেয়েছে। মানুষকে বনের জানোয়ার ভয় পায়। কেন পায়? মানুষ বড় বেশি চায়—তার চাওয়ার কোন সীমা নেই। মানুষের চোখে লালসা, পেটে ক্ষুধা, গলায় তৃষ্ণা। যত খাবে তত খেতে চাইবে। তাই তাকে ভয় পায় অন্য জানোয়াররা?

হঠাৎ প্রশ্ন মাথায় এল। সে অবাক হয়ে গেল। আজকাল তার মাথায় নতুন নতুন সব কথা আসছে। গাছেরা যেমন মাটি ফুঁড়ে

ওঠে তেমনি কথাগুলো ভিতর থেকে উঠে আসে।

সে বোধ হয় কিলাঁর হয়ে যাচ্ছে। তাদের সমাজে কখনো কখনো কোন একজন মানুষ কিলাঁর হয়ে যায়। তখন তারা দৈব-বাণী শুনতে পায়। আকাশ ও পাহাড়ের দেবতারা তার ভিতর থেকে কথা বলে। তখন অনেক নতুন নিয়ম আসে সমাজে। পুরনো রীতি পদ্ধতি অনেক বদলে যায়।

সে কিলাঁর হয়েছে—ভাবনা মাথায় আসতেই সারা শরীর বেয়ে শিহরণ খেলে গেল। তারপর শরীরের ওপর নেমে এল ভার। অদ্ভুত এই পরিবর্তন তার ভয় করতে শুরু করলো। ঘাবড়ে গিয়ে বললো, কি সব ভাবনা তোর মাথায় আসছে, অ্যাঁ!

সাবধান হবার কথা ভাবছে। কিলাঁর হয়ে ওঠা সহজ কথা নয়। তবু ভয় তাকে ছেড়ে যাচ্ছে না। মানুষ হয়ে মানুষকে ভয় পাচ্ছে। কেন এই ভয় তা বুঝতে পারছে না। ভয় বাঘের থাবা হয়ে বুকের মধ্যে বসে আছে।

মানুষগুলোকে এখন মানুষের মত মনে হচ্ছে না। মানুষগুলো অন্য কোন এক জাতের মানুষ। তারা দেখতেই শুধু মানুষের মত। তাদের দু'খানা করে হাত পা আছে। তবু তারা আলাদা। মানুষ হয়েও মানুষ নয়, অন্য কিছু। অন্য কিছু বলে কি বোঝাতে চাইছে? না, তা বুঝতে পারছে না। তবে মানুষকে মানুষ বলে মনে হচ্ছে না। একটা মানুষ হাত পা নেড়ে কথা বলছে। কি বলছে? কত জমি দখল নেবে তার হিসাব কষছে?

এত দূর থেকে সে কোন কথা শুনতে পাচ্ছে না। মানুষগুলোর হাত পা নাড়া দেখছে। দারোগা আর জমিদারের মত হাত পা নেড়ে কথা বলছে। তাদের চোখে তখন ক্ষুধা, জিভে লালা। এবার তারা এখানকার জমি লাল নিশান পুঁতে দখল করে নেবে?

মানুষগুলো একটা একটা করে সব গাছ কেটে ফেলবে। জঙ্গলে আগুন লাগাবে। তারপর শুরু হবে দখল। লাল নিশান

আর খুঁটি পুঁতে ধরিত্রীর বুক ভাগ করা হবে। মানুষগুলো জমির মালিক হবে। তারপর শুরু হবে খুঁটির অদল বদল। রাতের অন্ধকারে সীমানা ভাঙবে চোরের মত।

এখানেই শেষ হবে না। শুরু হবে কাড়াকাড়ি। কে কার জমি দখল করে নিতে পারে। তোমার গায়ে জোর আছে তুমি কেড়ে নেবে। আসবে আরো মানুষ। সমতল থেকে একের পর এক মানুষ আসবে। সবার শেষে আসবে সাদা চামড়ার মানুষরা. এসে বলবে, তোরা খাজনা দে। একের পর এক কানুন জারী হবে।

এ আশ্রয় আর নিরাপদ নয়, সে আপন মনে সিদ্ধান্ত নিল। মানুষগুলো আকাশ থেকে নেমে আসে নি। এরা সমতলের মানুষ। ওরা জানে কি ভাবে জমি ভাগ করে নিজের বলে দাবী করতে হয়।

এ রকম মানুষ তো সে দেখেছে। তাম্রজুড়ির হাটে অনেক দেখেছে। তাদের গায়ে থাকতো জামা। নুন, লঙ্কা কাপড় নিয়ে আসতো সকাই, পথ দিয়ে তারা সে সব নিত। অনেকে খাতক হয়ে বসতো। ঘরবাড়ি তৈরী করে থাকতো। বেড়া দিয়ে জমি ভাগ করতো। মানুষগুলো সব শানপ্রালালের মতো এক একটি নেকড়ে।

এবার সে আরো দুজন মানুষ দেখতে পেল। মাথায় টুপি। পিঠে বন্দুক একটা হরিণ মেরে টেনে নিয়ে আসছে। পিছনে যে সাদা চামড়ার মানুষ আছে তাতে তার আর সন্দেহ রইল না।

মানুষগুলো এখানে কেন? আবার তার মাথায় প্রশ্ন এল। সে ভয় পেয়েছে। উপত্যকা থেকে হাওয়া উঠে আসছে। হাওয়ায় জঙ্গলের কোন গন্ধ নেই, অন্য রকম গন্ধ। ক্ষুধার্ত জানোয়ারের গা থেকে এরকম গন্ধ আসে। মুখে থাকে পচা মাংসের গন্ধ। চোখ দুটো লোভের আগুনে জলে ওঠে। হাওয়ায় ভয়ের গন্ধ ছড়িয়ে দেয়। তার নাকে এখন সেই গন্ধ।

সে গুহার ভিতর ঢুকে গেল, মুরগীটাকে সঙ্গে নিল, গুহার অন্ধকার প্রকোষ্ঠে ঢুকে পাথরে ঠেস দিয়ে বসলো।

এখন সে আর পৃথিবীর মধ্যে নেই। পৃথিবীর বাইরে কোন এক গোপন আস্তানায় বসে আছে। তার চারপাশে অন্ধকার। সেই অন্ধকারে নিজেকে নিয়ে স্বস্তি পেতে চাইছে। স্বস্তি পেতে পারছে না। বুকের ঠিক মাঝখানটায় একটা তীক্ষ্ণ কাঁটা বিঁধে আছে।

অনেক সময় লাগলো স্বাভাবিক হতে। স্বস্তি ফিরে পেয়ে খাবার কথা ভাবলো। এখন খাবার তার হাতের মুঠায়। মুরগীর ডানা প্রথম ছিঁড়লো। চাকা চাকা করে মাংস কেটে মুখে ফেললো। দাঁত দিয়ে মাংস নরম করতে কষ্ট হচ্ছে। আঁশ হয়ে মাংস দাঁতের সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে।

এবার সে পাথরের ওপর মাংস রেখে পাথর দিয়ে ঠুকলো। মাংস থেতো হতেই মাংস খাওয়া অনেক সহজ হল।

আবার সে উঠে দাঁড়ালো। গিয়ে দাঁড়ালো ফোঁকরের সামনে। পায়ের ব্যথা তার মনে রেখাপাত করছে না। বার বার মানুষগুলোর কথা মনে আসছে। মানুষগুলো তার মাথার মধ্যে একটা গোঁজ হয়ে গেঁথে বসে আছে সে কিছুতেই ঠেলে ফেলতে পারছে না।

সে নিজেকে নিজে গালি দিল, এ্যাঁড়েকোড়া। তবু সে গুহার ফোকরের সামনে এসে দাঁড়ালো। মানুষগুলো যেন অদৃশ্য হাতে তাকে টানছে।

মানুষগুলো ঘাসের ওপর বসে আছে। একটা মানুষ একটা সাদা কাগজ বিছিয়ে কি যেন করছে। অন্য দুটো মানুষ বসে দেখছে আর মাঝে মাঝে মাথা নাড়ছে। তাদের পাশেই অন্য দুটো মানুষ আগুন জ্বেলেছে। আগুনের মাথায় একটা হাঁড়ি চাপিয়ে দিয়েছে।

মানুষগুলো ভাত রান্না করছে, সে আপন মনে ভাবলো। চোখের সামনে ভেসে উঠলো ভাতের ছবি। গরম ভাত মাটির থালায়। থালার সামনে সে বসে আছে। অন্যপাশে বসে আছে মা। গরম ভাত থেকে ধোঁয়া উঠছে। ভাতের গন্ধ নাকে আসছে। অদ্ভুত এক বিহ্বলতা

তার ভিতর নেমে আসছে।

এবার সে বিড় বিড় করে আপন মনে কথা বলতে শুরু করলো, মানুষ ভাত খায়। কাঁচা মাংস মানুষের খাদ্য নয়। সে কাঁচা মাংস খেয়েছে। কাঁচা মাংস খায় জানোয়ারে। নিজের হাতের পানে চোখ রেখে বললো, তুই, তুই একটা জানোয়ার বনে গেলি।

আবার চোখ তুললো। দেখতে পেল ভাতের হাঁড়ি। আগুনের শিখা হাঁড়ি ঘিরে ধরে নাচছে। হাঁড়ির ভিতর টগ্‌বগ্‌ করে ফুটছে ভাত।

এখন তার চোখে উলঙ্গ ক্ষুধা, ভাতের ক্ষুধা। কত দিন হল ভাত খায়নি—গরম ভাত। পলকহীন চোখে তাকিয়ে আছে। আগুন থেকে ধোঁয়া উঠছে। খোলা প্রান্তর দিয়ে দড়ির মত পাক খেয়ে ধোঁয়া আকাশে উঠে যাচ্ছে।

সে বসে পড়লো। ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে এখন। ভয় করছে। মানুষ হয়ে কাঁচা মাংস খেয়েছে। কোন বাছ-বিচার করে নি। বাঘের মাংস সে খেয়ে নিয়েছে যা খাবার নয়। সে মানুষ, মানুষকে কতক-গুলো নিয়ম পদ্ধতি মেনে চলতে হয়। সে নিয়ম মানে নি।

বনের দেবতা দেখছে। তার হাজার হাজার চোখ। গাছ, গাছের পাতা, পাহাড়, আকাশের মেঘ সবার চোখ আছে। তারা সবাই তোমাকে দেখছে। তুমি মানুষ, তোমাকে মানুষের মত আচরণ করতে হবে। তুমি তা করছো কিনা হাজার চোখ জাগ্রত হয়ে লক্ষ্য রাখছে। তোমার ডানে, তোমার সামনে, তোমার পিছনে—সব দিকে জাগ্রত চোখ। তোমার কাঁচা মাংস খাওয়া তারা দেখেছে।

সে এবার হাঁটু ভেঙ্গে বসতে চাইলো। হাঁটু ভেঙ্গে বসা তার পক্ষে সম্ভব নয়। ফোলা পাখানা কোন রকমেই ভাঁজ করতে পারবে না। সামান্যতম চেষ্টাতেই মাথার মধ্যে ঝন্ ঝন্ যন্ত্রণা ঝিলিক দিয়ে উঠছে।

সে পাথরের গায়ে ঝুঁকে পড়লো। কপাল রাখলো পাথরের

গায়। দু'হাত রাখলো বুকের ওপর। বিড় বিড় করে বললো, হে পর্বতের দেবতা মাফ কর। হে অরণ্য আমাকে ক্ষমা কর। আমার আচরণ মানুষের মত হয়নি, তোমরা দেখেছো আমার পাপ। আমাকে ক্ষমা কর।

দু'চোখ বেয়ে জল নেমে এল তার।

বিস্ময় বিহ্বল চোখে দেখছে আগুন। কি আশ্চর্য তার রূপ। কত দিন হল সে আগুন দেখেনি। এখন আগুন দেখছে। দু'চোখ দিয়ে আগুন গিলে খাচ্ছে। ইচ্ছে করছে দৌড়ে যেতে। এক টুকরো আগুন নিয়ে আসবে। আগুন ঘরে পেলে তাকে যত্ন করে রক্ষা করবে। ঠিক শিশুকে যেমন মা আগলে রাখে তেমনি করে আগলে রাখবে। শিকার করা মাংস আগুনে ভেজে খাবে।

শুধু মাংস খাবে কেন? আগুন পেলে সে ভাত খাবে। পাহাড়ের গা ঘেঁষে একখানা ঘর তৈরী করে নেবে। তার পাশে থাকবে তার ক্ষেত। ক্ষেতখানাকে যত্ন করে চষে ফেলবে। চষার কাজ শেষ হলে জল লাগাবে। তারপর ফসলের বীজ বুনবে। প্রথম বুনবে ধান। তারপর মকাই। কিছু গম জন্মাতে পারলে হবে চমৎকার।

কয়েকটা মানহান গাছ ঘরের পাশে লাগিয়ে দেবে। সবুজ লতা উঠে যাবে চালের ওপর। প্রথম ছোট ছোট নীল ফুল ফুটবে। তার পর চালের মাথায় একের পর এক মানহান ফল শুয়ে থাকবে। দাঁকুরা বলে শিম। শিমের বিচি শুকিয়ে পিঠে তৈরী করতে কিন্তু জানে না।

এবার তার মনে এল হাঁড়ির কথা। হাঁ, সে মাটি দিয়ে হাঁড়ি তৈরী করবে। আর একটা জলের কলসী। লোটা, বাটী, থারি, শিঠি এসব তৈরী করে নিতে হবে। আগুনে পুড়িয়ে নিলে শক্ত হয়ে যাবে।

সমতলে একখানা ঘর তৈরী না করলেও চলবে। গুহার মুখে একখানা বেড়া দিলে তার ঘর হয়ে যাবে। একা একা ঘর তৈরী করতে

পারলেও চাল তৈরী করা যায় না। আর একজন সঙ্গী দরকার হয়। তার থেকে সে হাঁড়ি কলসী তৈরী করে সময় কাটাবে। ঘরের মধ্যে থাকবে ভাত রান্না করার হাঁড়ি আর জল আনার কলসী। থালা বাটি তৈরী করে নিলে গরম গরম ভাত খেতে পারবে।

একের পর এক ভাবনা তার মাথার মধ্যে এসে যাচ্ছে। একা থাকবার কথা ভাবছে কেন? এবার তার সঙ্গীর কথা মনে এল। তাদের বস্তিতে অনেক যুবতী ছোপম কুড়ী ছিল। একজনকে ভালো লাগতো। মুখিয়া। আচ্ছা, মুখিয়াকে নিয়ে এলে—

এবার সে দেখতে পেল মুখিয়াকে। তার সামনে মুখিয়া দাঁড়িয়ে আছে। সুবর্ণরেখার নদীর জলে নেমে স্নান করেছে। গায়ের কাপড় ভিজে ভিজে চুল থেকে জল পড়ছে। মুখিয়ার কাঁধে কলসী। কলসী ভর্তি জল।

তাকে দেখে মুখিয়া দাঁড়িয়ে আছে। মুখের রং লাল। থেকে থেকে মুখিয়া চোখ তুলছে। চোখের মধ্যে চিক্ চিক্ করে আলো জ্বলছে। আলো নয় তীর। আলো তীরের ফলা হয়ে তার বুকের মধ্যে বিঁধে যাচ্ছে। আর তার চেতনায় একটা মরিয়া ভাব এসে যাচ্ছে। মুখিয়াকে আদর করতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু যা ভাবছে তা করছে না। নিজের ইচ্ছা দমন করে রাখছে। সমাজ আছে, আছে তার নিয়ম পদ্ধতি। সেই নিয়মপদ্ধতিগুলো চোখে দেখা যায় না—তবু তারা আছে। নিয়মপদ্ধতিগুলো দড়ির মত। সে তোমাকে আর তোমার মুখিয়াকে বেঁধে রেখেছে। তোমরা ইচ্ছা করলেই নিয়ম পদ্ধতিগুলো ভাঙতে পার না।

মুখিয়া বলছে, মরদ পথটো ছাড়।

মরদ, পথটো ছাড়—মুখিয়া তাকে মরদ বলছে। আশ্চর্য এক সুখের শিহরণ নিজের মধ্যে অনুভব করছে। ছোট একটি শব্দের কি অপরিসীম শক্তি—সে যত ভাবছে তত অবাক হয়ে যাচ্ছে।

এখন তার সেই চাঁদনী রাতের কথা মনে আসছে। সে একটা

বাঁশী নিয়ে বসে ছিল মহুয়া গাছের নিচে। বাঁশী বাজাচ্ছিল। মুখিয়ার জন্যই ত সে বসেছিল। মুখিয়া শুনুক তার বাঁশীর কান্না। এসে বসুক তার পাশে। সামনেই সুবর্ণরেখা নদী। এখন জোয়ার। চাঁদের আলো চিংড়ি মাছের মত ঝলক দিচ্ছে। প্রেম পীড়িতের মানুষদের কাছে ডাকছে।

মুখিয়া বড় খতনার মেয়ে। এসে দাঁড়িয়ে ছিল মুহুয়া গাছটার পিছনে। কখন এসেছে টের পায় নি। নিরবে দাঁড়িয়ে ছিল। টের পেতেই ছুট পালিয়ে গেল। সে নিজেও দৌড়ে ছিল ধরবে বলে। ধরতে পারে নি। মুখিয়া তখন বনের ছুটন্ত হরিণী হয়ে ছিল। হরিণীর সঙ্গে দৌড়ে কোন মানুষ পারে।

এখন তার লোভ হচ্ছে। পুরনো জীবনে আবার ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে। মানুষের জীবন কত সুখের। পিতৃ পুরুষেরা ক্ষেত চাষ করে, হাঁড়ী কলসী তৈরী করে, ঝুড়ি বুনে কত সুখে জীবন চালিয়ে গেছে। তারা শিকার করতো। দল বেঁধে হাড়িয়া খেত। জ্যোৎস্না রাতে মেয়েরা গোল হয়ে নাচতো। পুরুষেরা মাদল বাজাতো আর হাড়িয়া খেত। হোপন কুড়ীদের সঙ্গে রাঙ্গা কালা করতো।

সব শেষে ঘটক লাগিয়ে দিত। ঘটক এসে মেয়ের বাপটাকে জিজ্ঞাসা করতো, তোর মেয়েটাকে বিয়ে দিবি?

মেয়ের বাপটা বলতো, কে তোর পাত্র।

ঘটক নামটা বলতো। মেয়ের বাপ রাজী হয়ে যেত। হলুদ, তেল, গামছা পাত্রের বাড়ি পাঠিয়ে দিত। কলসী কলসী হাড়িয়া তৈরী হত। একটা পাঁঠা কাটা হত সবাইকে ভোজ দেবার জন্য।

সে জীবন তাদের হারিয়ে গেল। সমতলের মানুষরা প্রথম পাহাড়ে উঠে এল। এসে গোলমাল পাকাল। তাদের পিছনে পিছনে এল সাদা চামড়ার মানুষরা। কানুন বদলে গেল। রাস্তা তৈরী হল। রাস্তা দিয়ে উঠে এল রুপোর টাকা। তাদের জীবন

অন্য রকম হয়ে গেল।

এবার সে বিমর্ষ হয়ে পড়লো।

গুহার ফোকর থেকে সরে যেতে পারছে না। অদৃশ্য এক দড়িতে সে যেন বাঁধা পড়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে দাঁড়িয়ে থাকতে তবু সরে যেতে পারছে না। ফোলা পা সামনের দিকে প্রসারিত করে দিয়ে এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে।

বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। দু'চোখ ভরে দেখছে আগুন। এ যেন নতুন করে আগুন দেখা। লাল আগুন হাঁড়ির চারপাশে। আগুন হাঁড়ির গা বেয়ে ওপর দিকে উঠছে। এত দূর থেকে আগুনের শিখাকে সাপের ফণার মত মনে হচ্ছে। হাঁড়ির গায়ে ওরা একের পর এক ছোবল হানছে। যত ছোবল হানছে তত ভিতরের জল গরম হয়ে উঠছে। জলের মধ্যে চাল। চাল নরম হয়ে উঠছে, ফুলে উঠছে, হাওয়ার বুকে মিষ্টি গন্ধ ভাসিয়ে দিচ্ছে।

নিজের হাতখানাকে যদি দড়ির মত লম্বা করে ফেলতে পারতো। সেই দড়ির মত হাত ফোকর দিয়ে মাঠে নেমে যাবে। মাঠ পাড়ি দিয়ে চলে যাবে আগুনের কাছে। একখানা জ্বলন্ত কাঠ তুলে নিয়ে আবার ফিরে আসবে। লোকগুলো টের পাবে না। তখন তার হাতের মুঠোয় আগুন। জঙ্গলের মধ্যে হাতের মুঠায় আগুনের মত সম্পদ আর কি থাকতে পারে?

গলা থেকে ঢেকুর উঠে এল। নাকে এল কাঁচা মাংসের গন্ধ। তাকালো মুরগীর মাংসের পানে। চাকা চাকা করে কেটে পাথরের ওপর সাজিয়ে রেখেছে। দু'দিন চালাবার মত মাংস তার হাতে মজুত আছে। আগুন থাকলে মাংস আরো কয়েক দিন রক্ষা করা যাবে। ধোঁয়ায় শুকিয়ে নিলে কয়েক দিন মাংস টিকিয়ে রাখা যায়, পচে না। এ সব কথা তার যত মনে আসছে তত নিজের ভিতর উদ্দীপনা অনুভব করছে।

আবার তার মুখিয়ার কথা মনে এল। মুখিয়া সেদিন হরিণীর মত পালিয়ে গেল। সে পিছনে পিছনে দৌড় দিয়েছিল। মুখিয়া জঙ্গলের মধ্যে কোথায় যেন লুকিয়ে পড়লো। সে তখন পাগলের মত শাল বনে মুখিয়াকে খুঁজছে। ততক্ষণে মুখিয়া তাকে ফাঁকি দিয়ে সুবর্ণ রেখার বিশাল বালির চড়ার ভিতর নেমে পড়েছে। তারপর জ্যোৎস্নার মধ্য দিয়ে একটা পরীর মত ভাসতে ভাসতে বাস্তিতে চলে গেল। সে দৌড়ে নাগাল পায় নি

মুখিয়াকে ধরতে পারলে সে কি করতো? পালিয়ে যেতে দিত না শক্ত করে বুকের মধ্যে চেপে ধরতো। জোর করে ঠোঁটের ওপর ঠোঁট ঘষে দিত। মুখিয়া হেরে গিয়ে রেগে যেত কিন্তু বদলা নিতে পারতো না। সে তো কপালে সিঁদুর বা সুবর্ণরেখার মাটি ঘষে দেয় নি।

ইপুতুত করে নি হ্যাঁ, জোর করে সিঁদুর দিলে ইপুতুত করা হত। মুখিয়ার সম্মতি সে পায় নি। তার বাপ মাকে বলা হয় নি। হয়তো মুখিয়া ইপুতুত করাতে রেগে গিয়ে বাপকে বলে দিত। বিয়ে করবি বাপটাকে বল। তুই জোর করবি কেন? মাঝির কাছে নালিশ চলে যেত তারপর পাচ বসতো তাকে সবার মাঝখানে লাঠি পেটা করা হত।

ঠোঁটের ওপর ঠোঁট ঘষে দিলে মুখিয়া কিছু করতো না। পরের দিন সে বুড়ো বাপটাকে বলতো, বলতো—

হল না। ভোর না হতেই সব বদলে গেল। বেনিয়া এল খত নিয়ে গরু দুটো নিয়ে যেতে। মুখিয়া তখন মাতৃবন্দনা করতে সিঁদুর, তিল নিয়ে গোয়াল ঘরে এসেছে। হাড় জির জিরে দুটো গরু মুখিয়ার যত্নে গরুর মত গরু হয়ে উঠেছে। দুটো মরা গরু গরুর মত গরু হয়ে কখন তারা ফাঁস হয়ে গেছে মুখিয়া মুখিয়ার বাপ বুঝতে পারেনি।

প্রসারিত পা খানা টন্ টন্ করে তার ভাবনা চিন্তায় গোলমাল

করে দিচ্ছে। আর পা টান্ টান্ হয়ে থাকতে চাইছে না। এবার গিয়ে সে পাথরের ওপর শুয়ে পড়বে। ভাববে মুখিয়ার কথা।

কিন্তু ফোকর থেকে সরে যেতে পারছে না।

নিচের মানুষগুলো এবার শাল পাতা বিছিয়ে বসে পড়েছে। একজন মানুষ হাড়ি আগুন থেকে নামিয়ে নিয়েছে। এবার শাল পাতায় ভাত দেবে, গরম ভাত। সাদা ফুলের মত ভাত। সেই ভাত থেকে গন্ধ উঠে আসবে। সে নাকে গন্ধ পাচ্ছে। গরম ভাতের গন্ধ নাকের মধ্য দিয়ে কোথায় যেন পৌঁছে যাচ্ছে। তার নেশা লাগছে। চোখ জড়িয়ে আসতে চাইছে আবেশে। আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। ভাত ঘুম তাকে জড়িয়ে ধরেছে। বড় সুখের ঘুম।

সে পাথরের ওপর টান টান হয়ে শুয়ে পড়লো।

গভীর রাতে ঘুম ভাঙলো। অমনি আগুনের কথা মনে এল। সঙ্গে সঙ্গে গুহার মুখে চলে এলো। চাঁদ এখনো ওঠেনি। মাঠ অন্ধকার। পাহাড়, গাছপালা গভীর অন্ধকারে একাকার। মানুষগুলো নেই। তারা কখন চলে গেছে তা জানা নেই। গভীর অন্ধকার দেখে সে নিশ্চিন্ত হল। মানুষগুলো থাকলে আগুন জ্বালাতো। আগুন না জ্বালিয়ে কতগুলো মানুষ জঙ্গলে রাত কাটায় না।

মানুষগুলো আগুন ফেলে রেখে গেছে পোড়া কাঠ কয়লার মধ্যে এখন সে আগুন লুকিয়ে আছে। ছাইয়ের মধ্যে আগুন আত্মগোপন করে থাকে। হাওয়া পেলে প্রথম ফুলকী তোলে, তারপর জ্বলে ওঠে।

আগুন পাবার সম্ভাবনার কথা মনে আসতেই সে রক্তের ভিতর চাঞ্চল্য অনুভব করলো। আপনা থেকে হাত লগুড়ে গেল। শক্ত মুঠোয় লগুড় চেপে ধরলো। এখন সে পাহাড় থেকে নিচে নেমে যাবে। লুকিয়ে থাকা আগুনকে ফের জাগিয়ে নিয়ে আসবে।

গুহার মুখের কাছে এসে একবার থমকে দাঁড়ালো। একটু ইতস্তত করলো। বাঘের কথা মনে এল। বাঘ বেশি দূরে সরে নাও যেতে পারে।

সে হাত থেকে লগুড় নামিয়ে রাখলো। এবার সে তার হাতে তৈরী পাথরের বর্শাখানা তুলে নিল। লতা দিয়ে সূচালো পাথরখানা শক্ত করে বাঁধা আছে। এখন লগুড় অপেক্ষা বর্শা অনেক বেশি কার্যকরী।

গুহার মুখের কাছে দাঁড়িয়ে রইল। তার চারপাশে অন্ধকার। আকাশ কালো। হাজার হাজার প্রদীপের আলো আকাশে জ্বলে ওঠেনি। মেঘ করেছে। মেঘের আড়ালে আকাশের তারারা আর চাঁদ দাঁড়িয়ে আছে।

অন্ধকারের মধ্যে সে একা দাঁড়িয়ে আছে। আর কিছু নেই। এই বিশাল আকাশের পটভূমিকায় আর অন্ধকারের মধ্যে নিজেকে বড় নিরর্থক মনে হয়। এই বিশাল পাদপীঠে কতটুকুইবা মানুষের ভূমিকা। আসে আর যায়। তবুও সে আমার আমার বলে জমি গ্রাস করতে চায়। একের পর এক জমি দখল করে। কত দূর দেশ থেকে মানুষ আসে—সমুদ্র পাড়ি দিয়ে সাদা চামড়ার মানুষরা এসেছে কিসের আশায়?

মানুষ একটা আহম্মক জীব, সে আপন মনে বললো। হ্যাঁ, আহম্মক সে মাথায় ঝাঁকুনি দিয়ে বললো। থুথু ফেললো।

আবার আগুনের কথা মনে এল। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে অন্য কথা এল। বেঁচে থাকবার অনিবার্য তাগিদ নিজের ভিতর অনুভব করলো। অমনি আগুনের জন্য তীব্র আগ্রহ এবং আকুলতা তার ভিতর ফিরে এল।

অন্ধকারের মধ্যে গুহা থেকে নামার মত সাহস হারিয়ে ফেলছে। অথচ এখন নামতেই হবে। অন্ধকারের মধ্যে শিকার হয়ে যেতে পারার সম্ভাবনা মেনে নিয়ে নিচে নামতে হবে। আগুন যে

তার চাই।

গুহা থেকে অন্ধকারে নিচে নামা ভয়ঙ্কর কষ্টসাধ্য কাজ। বিপজ্জনক। সামান্যতম অসতর্কতায় পাকা ফলের মত নিচে পড়ে যেতে পারে। তবু সে নামছে। নামার সময়ে পাথরে কপাল ঘষে গেল। চামড়া উঠে গিয়ে রক্ত নেমে এল। গাল বেয়ে রক্ত নামা টের পাচ্ছে। হাত দিয়ে রক্ত পুছে নিচ্ছে না। নিজের পরিণামের কথা আর মনে আসছে না। ফোলা পা নিয়ে ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে তার। নিচে পা নামিয়ে দিচ্ছে অথচ জানে না সেখানে আর একখানা পাথর আছে কি না।

আবার ভাবলো—মানুষগুলো এই গভীর জঙ্গলের মধ্যে এসেছিল কেন। পাহাড়ের নিচে সমতলে জমির অভাব হল নাকি। পৃথিবী নাকি অনেক বড়—এত বড় যে দু' কুড়ি জীবন হেঁটেও পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পাওয়া যাবে না। পৃথিবী যদি এত বড় হবে তবে সাদা চামড়ার মানুষরা এত দূরের দেশে এল কেন? কি আছে এই পাহাড়ে যে সাত সমুদ্র তের নদী পাড়ি দিয়ে সাদা চামড়ার মানুষদের আসতে হল। অদ্ভুত সব কাণ্ড করে সমতল আর সাদা চামড়ার মানুষরা। ওরা হয়তো জানে না ওদের কি চাই বা কি কি দরকার। নয়তো এত হুড়ো হুড়ি আর কাড়াকাড়ি কেন? জঙ্গল পর্যন্ত নিজের মত নিজে আর থাকতে পারছে না।

ভাবতে ভাবতে সে নিচে নেমে এল। একটু দাঁড়ালো।

সামনে এখন সমতল ভূমি। মাঠখানা অন্ধকারে অজানা রহস্য বিছিয়ে রেখে শুয়ে আছে। মাঠের কোন জায়গায় আগুন জ্বেলেছিল অন্ধকারে বুঝতে পারছে না। তবু সে আর দাঁড়ালো না। পা টেনে টেনে এগিয়ে চললো।

মাঠের মধ্যে অন্ধকারে আগুন খুঁজছে, অন্ধের মত খুঁজছে। চোখে এখন আগুন দেখা যাবে না। উষ্ণতার মধ্যে আছে ঘুমন্ত আগুনের সন্ধান। সে এখন আর আরণ্যক পশুর কথা ভাবছে না।

বাতাসের গন্ধ নিচ্ছে আর পা টেনে টেনে এগিয়ে চলছে।

প্রতিমুহূর্তে সামনে এখন তার অন্তরায়। মানুষগুলো মাঠের অনেক জায়গায় গর্ত করেছে। গাছের ডালপালা কেটে ফেলেছে। তাকে সাবধানে চলতে হচ্ছে। আগুন তাকে পেতে হবে। আগুন মানুষের জীবনের মত। আগুন তার বর্তমান। আগুন তাকে দিতে পারে আগামী দিনের ভরসা।

পায়ে উত্তাপ টের পেয়ে থমকে দাঁড়ালো। হাত রাখলো। আছে, আছে আগুন। গভীর আগ্রহের সঙ্গে পোড়া কাঠের ছাই নাড়তে থাকলো, আগুন পেল না। এবার সে ফুঁ দিতে শুরু করলো। একটা আগুনের ফুলকী উঠে আসতেও পারে।

এখন সে ছাই সরিয়ে ফুঁ দিয়ে চলছে। বুক ভর্তি করে হাওয়া নিয়ে আবার তা উগরে দিচ্ছে। একটা আলোর ফুল্‌কি জেগে উঠলো। আবার ফুঁ দিল। আবার কয়েকটা ফুল্‌কি। শুকনো পাতা ফুল্‌কির পাশে রাখলো। শুকনো পাতা রেখে আবার ফুঁ দিল।

দপ্‌ করে শুকনো পাতা জ্বলে উঠলো। আলো এসে লাগলো তার মুখে। আরো শুকনো পাতা এনে আগুনের ওপর রাখলো। আগুন এবার মাটি থেকে অনেক ওপরে উঠে এল। লম্বা লম্বা জিভ দিয়ে একের পর এক পাতা গ্রাস করে এসে ডাল-পালা ধরে নিল। আলো ছড়িয়ে পড়লো। মাঠের খানিকটা অংশ আলোকিত হয়ে উঠলো।

এখন সে ঘাস স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। কাঁচা পাতা জ্বলছে বলে চিড়বিড় করে আওয়াজ উঠছে। দূরের ঝোপঝাড় আগুনের আলোতে দেখা যাচ্ছে। আগুনের শিখা ক্রমশ ওপর দিকে উঠছে। যত আগুন ওপরে উঠছে তত আলো দূরে দূরে চলে যাচ্ছে। তার গায়ে আগুনের তাপ এসে লাগছে।

আগুন, সে অস্পষ্ট গলায় বললো। মন ভরলো না। জোরে

জ্বললো, আগুন। তবু প্রাপ্তির চাঞ্চল্য প্রকাশ পেল না। উঠে দাঁড়ালো। বনের পানে তাকিয়ে চিৎকার করে বলে উঠলো, আগুন—।

তবু তার মনের উচ্ছাস যেন প্রকাশ করতে পারলো না। এবার সে জ্বলন্ত কাঠ হাতে তুলে নিল। উল্লাসে বুকের রক্ত চঞ্চল। এখন সে সামনের মাঠখানায় দৌড়বে। দৌড়বার আগে সে লাফিয়ে উঠলো। অনেকটা ওপরে উঠে নেমে এল তার শরীর নিচে। ফোলা পায়ের কথা মনে ছিল না। ফোলা পাখানা পড়ে গেল গর্তের মধ্যে। পায়ে প্রচণ্ড জোরে লাগলো। মট্ করে একটা শব্দ সে শুনতে পেল। তারপর কাত হয়ে পড়ে গেল। হাঁটুর কাছে চোট খাওয়া পায়ের হাড় দু' টুকরো হয়ে গেল। ঝন্‌ঝন্ করে উঠলো মাথার মধ্যে। দু' চোখ অন্ধকার এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

রাত্রি আপন নিয়মে এগিয়ে চলে। হাড় ভাঙ্গা পা নিয়ে সে পড়ে আছে আগুনের পাশে। আগুন আর নেই। চারদিক নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ঢাকা। একমাত্র দিগন্তের ওপরে আকাশের বুকে আলোর আভা। সে পড়ে আছে, চেতনাহীন।

পাহাড়ের মাথায় আলো ফেলে চাঁদ উঠে এল। আলোয় উদ্‌ভাসিত আকাশ। তার অর্দ্ধমগ্ন চেতনায় একটা লাল গরু। গরুর পাশে শনিয়ালাল।

এবার জ্ঞান ফিরে এল তার। সে চমকে উঠলো। একে একে মনে জেগে উঠলো পর পর ঘটনা। সব শেষে মনে এল আগুনের কথা।

এবার সে উঠে বসতে চাইলো। ভাঙ্গা পা টেনে তুললো ওপরে। অসহ্য যন্ত্রণা তার মাথার মধ্যে। দাঁতে দাঁত লাগিয়ে সহ্য করে নিতে চাইছে। এবার সে একখানা কাঠ চেপে ধরলো হাতে। আগুন আছে। কাঠ পুড়ে লাল হয়ে আগুনের অস্তিত্ব জানিয়ে দিচ্ছে।

এবার তাকে উঠে দাঁড়াতে হবে কিন্তু উঠতে পারছে না। বর্শার

ওপর দেহের ভার রেখে উঠে দাঁড়াতে চাইলো। মাথা ঘুরছে। পায়ের গাঁটে কে যেন টাঙ্গী দিয়ে ঝপাঝপ কোপ মারছে। তার শরীর যন্ত্রণায় কেঁপে কেঁপে উঠছে।

ফোলা পাখানা এখন আর তার পা নয়। তবু পাখানা তার শরীরের সঙ্গে ঝুলে আছে। হাঁটুর গাঁটের কাছ থেকে হাড় ভেঙ্গে ওপর দিকে ঠেলে উঠেছে। মালাইচাকীখানাকে দেখতে পাচ্ছে না। অথচ সে আছে। চামড়ার বাঁধন না থাকলে পা তার সঙ্গে ঝুলে থাকতে পারতো না। হাড় টুকরো হয়ে গেলেও পা আছে সঙ্গে। যদি চামড়ার বন্ধন না থাকতো পাখানাকে ফেলে রেখে চলে যেতে পারতো গুহার আশ্রয়ে। এখন আর তা সম্ভব নয়। ঝুলে থাকা পাখানাকে টানতে টানতে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে। মাঠের মধ্যে শুয়ে থাকা যাবে না। হয়তো বাঘটা কাছাকাছি কোথাও আছে। পেট ভর্তি বলে এখনো হানা দেয়নি।

মেঘ সরে গেছে। এখন চাঁদ মাঝ আকাশে। মেঘের বুকে আলো। আলো পাহাড়ের মাথায়। জ্যোৎস্নার আলো শুয়ে আছে সমতল জমিতে। গাছের পাতায় পাতায় চাঁদের আলো চিক্ চিক্ করে জ্বলছে।

এ সব সে দেখছে না। এক হাতে তার আগুন অন্য হাতে তার নিজের হাতে তৈরী বর্শা। বর্শার উপর শরীরের ভার রেখে পায়ে পায়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলছে। এক পা সমনে নিয়ে পেছনের ভাঙ্গা পা সামনের দিকে টেনে নিচ্ছে। দুঃসহ এক যাত্রা। প্রতিবার সামনের দিকে এগিয়ে যেতে ভাঙ্গা পাখানা নাড়া খাচ্ছে। ঝন্ ঝন্ করে উঠছে মাথার মধ্যে। সে দাঁতে দাঁত দিয়ে কামড়ে নিজেকে সামলে নিতে চাইছে।

পাহাড়ের সামনে এসে দাঁড়ালো। এবার সামনে আরো কঠিন পরীক্ষা। ধাপে ধাপে পাহাড় বেয়ে ওপরে উঠতে হবে। অসম্ভব, সে ভাবলো। তবু দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না। আপন মনে

বললো, এখন তোমাকে উঠতেই হবে। অন্য কোন উপায় সামনে আর নেই।

সে নিজের ভিতর শক্তি খুঁজছে। ভিতরের মানুষটাকে এখন পাওয়া যাবে না। তাই বলে হাল ছেড়ে দিতে পারে না। কে ছাড়তে চায়? নিজেকে নিজে জিজ্ঞাসা করে নিজেই জবাব দিল—না, আমি মরবো না। বুক ভর্তি করে বাতাস নিল। এবার সে ওপরে উঠবে—তাকে উঠতেই হবে।

এক পায়ে উঠতে হচ্ছে তাকে অন্য পাখানা পাথরের ওপর রাখতে পারছে না। পাখানাকে ঝুলিয়ে রাখতে হাঁটু ওপর দিকে তুলে রাখতে হচ্ছে। এক হাতে তার জ্বলন্ত কাঠ। কাঠখানা হাতে থাকার অর্থ আগুন হাতে থাকা। অন্য হাতে বর্শা। দুটোই জরুরী। কোনটাই হাত ছাড়া করতে পারবে না।

গুহার মুখের কাছে এসে দাঁড়ালো। একবার তাকালো নিচের দিকে। সামনের পথটুকু উঠে আসতে তাকে জীবনী শক্তির সবটুকু নিঙরে দিতে হয়েছে। সারা গায়ে ঘাম। পাথরের ফাঁকগুলো ভয়ানক বড় বলে মনে হচ্ছে। একই দৃশ্য সময়ে সময়ে কি রকম বদলে যায়!

দু'হাত সামনে প্রসারিত করে পাথর ধরে পেছনের ওজন ওপরে তুলে আনতে হয়েছে। এখন হাঁপিয়ে পড়েছে। জোর করে বাতাস টেনে নিতে হচ্ছে নয়তো দম পাচ্ছে না। বুক হাপরের মত ঠেলে ঠেলে উঠছে। নিজেকে আর এক পায়ে দাঁড় করিয়ে রাখতে পারা অসম্ভব।

ভিতরের মানুষটা আর বাইরে বেরিয়ে আসছে না। তাকে বাইরে পেলে সে একটু কথা বলতে পারতো। বলতে পারতো, তুই একটা মানুষ। হ্যাঁ, তুই একটা পশুর মত অসহায় অবস্থায় মরতে পারিস না। মানুষকে শেষ পর্যন্ত বাঁচার জন্য চেষ্টা করতে হয়।

এখানে তোমার ইচ্ছা অনিচ্ছা বড় কথা নয়, তোমাকে বাঁচতে হবে এই হল সব কথার শেষ কথা।

এ সব কথা সে গুহার মুখে দাঁড়িয়ে ভাবছে। একটা পা এখন জঙ্গলের অপদেবতা হয়ে তার সঙ্গে ঝুলে আছে। থেকে থেকে শয়তান ধারালো নখ বসিয়ে কামড় দিচ্ছে। শয়তানের পা আর তার শরীরের সঙ্গে ঝুলে থাকতে চাইছে না। অথচ পাখানা খসে পড়ে যাচ্ছে না। ঝুলে থেকে মাথার মধ্যে টাঙ্গীর কোপ মারছে।

গুহার মুখে কোন রকমে উঠে এল। ওপরে উঠে নিজেকে হারিয়ে ফেললো। এক পা আর সামনে যাবার শক্তি নেই। শ্রান্তিতে অবসন্ন দেহ নিয়ে গুহার মুখে শুয়ে পড়লো। একটা পা টান টান, অন্য পাখানা কোন রকমেই পাথরের ওপর রাখতে পারছে না।

তবু সে শুয়ে আছে। গল গল করে ঘামছে। এত ঘামছে যেন জলের মধ্যে শুয়ে আছে। মাথা ঝিম্ ঝিম্ করছে। হাড়িয়া খেয়ে বেসামাল হয়ে পড়া মানুষের মত শুয়ে আছে। ঘুম নয়—তবু সে আর পৃথিবীতে নেই। শব্দহীন এক বোবা পৃথিবীর কালো অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে।

এ এক নতুন পৃথিবী। আলো নেই শুধু অন্ধকার। একটা লোমশ ভল্লুক অন্ধকার হয়ে তার মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। সেই যন্ত্রণায় অবসন্ন শরীর বার বার কেঁপে কেঁপে উঠছে।

হয়তো এক সময় ঘুমিয়ে পড়তো। ঘুম আসার মুহূর্তে নিচের জঙ্গল থেকে আর্তনাদ ভেসে এল। মরণ আর্তনাদ। করুণ অথচ বীভৎস। পর পর আর্তনাদ নিচে থেকে ওপরে উঠে এল।

একটা শম্বরের পিঠের ওপর কে যেন ঝাঁপিয়ে পড়েছে। শম্বর বীভৎস গলায় চিৎকার করে দৌড় লাগিয়েছে, সে বাঁচতে চায়। জানোয়ারটা পিঠ থেকে নেমে যায়নি। এবার শম্বর জানোয়ারটাকে পিঠ থেকে ঝেরে ফেলতে চাইছে। জানোয়ারটা দাঁত বসিয়ে ঝুলে

আছে। জঙ্গলের মধ্যে মরা বাঁচার লড়াইয়ের তীব্র শব্দ ওপরে উঠে আসছে। তাকে বাঁচার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে।

এই আলো বাতাসে বেঁচে থাকা কত কঠিন, অথচ সবাই বাঁচতে চায়। বেঁচে থাকার জন্য জীবন সিংবোঙার নিয়ম। সেই নিয়ম মানুষ আর অরণ্যের পশুকে মেনে চলতে হয়।

সে উঠে বসলো। উঠে বসতেই আবার হাঁটুর মধ্যে টাঙ্গীর কোপ পড়লো। শয়তান ধারালো দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরেছে। দাঁত লাগিয়ে চাপ দিচ্ছে আর ঝন্ ঝন্ করে উঠছে মাথার মধ্যে। সে টের পাচ্ছে দাঁতের কামড় মেরুদণ্ড বেয়ে কত দ্রুত ওপরে উঠছে। ওপরে উঠে মাথার ঠিক মাঝখানে টাঙ্গী বসিয়ে দিচ্ছে।

দে, দে এড়িলিংকোড়া, সে বিড় বিড় করে বললো। তোর দাঁত দিয়ে পা কামড়ে কামড়ে খা—আমি হার মানবো না।

গুহার ভিতরে ডান হাতে আগুন ঠেলে ঢোকাতে শুরু করলো। বাঁ হাতের ওপর শরীরের ওজন। ঠেলতে ঠেলতে জলন্ত কাঠ গুহা গহ্বরে নেমে গেল। তারপর সে নিজের শরীর ঘুরিয়ে ফেললো এবার সে উবুড় হয়ে দুই কনুইতে শরীরের ভার রেখে একটু একটু করে এগোতে থাকলো। ভাঙ্গা পা সরিয়ে নেওয়া কঠিন। তা হোক, মানুষকে অনেক কঠিন কাজ করতে হয়।

গুহার মধ্যে মাথা গলিয়ে দিল। এবার নিচে নামতে হবে। নিচে নামতে গিয়ে সে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে গড়িয়ে পড়লো। মাথা পাথরে ঠুকে গিয়ে ঝন্ ঝন্ করে উঠলো। আবার গভীর অন্ধকারে তলিয়ে গেল।

কয়েকবার চেতনা এসে আবার মিলিয়ে গেল। সে জানে না তার দেহের মধ্যে কতরকমের অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে চলছে।

পর পর দিন ও রাত্রি পার হয়ে গেল। পাহাড়ের মাথায় সূর্য নিয়ম মত উঠে আবার পশ্চিম আকাশে শাল বনের আড়ালে নেমে

গেছে। নেমে যাবার আগে বেলপাহাড়ীর দেব পাহাড়ের মাথায় মুঠো মুঠো আবির ছড়িয়ে দিয়ে গেছে। কখনো সে ছিল অচেতন, কখনো ঘুমের ঘোরে।

তার হাতের নাগালের মধ্যে ছিল চাকা চাকা করে কাটা মুরগীর মাংস। আগুনে ঝলসে খাবার কথা ভেবেছিল। আগুনের আঁচ পেলে মাংসের স্বাদ বদলে যায়। মাংস আরো সুস্বাদু হয়ে ওঠে। তারা দল বেঁধে শুকনো পাতা আর ডালপালার আগুনে বনের মধ্যে বসে ঝলসে মাংস খায়। ঝলসে নেওয়া খরগোস, বনমোরগ অথবা হরিণ শাল পাতায় চিত হয়ে থাকে। তারা এক এক জনে এক এক খাবলা তুলে মুখে পুরে দেয়। সে মাংসের স্বাদ আলাদা।

চাকা চাকা করে কেটে রাখা মুরগীর মাংস মানুষটির জন্য ছিল। কিন্তু আগুনের আঁচ পেল না। প্রথমে মাংস ফুলেছে তারপর পচন ধরেছে। এখন পচা গন্ধে গুহা গুমোট। অবশ্য তার নাকে গন্ধ কোন সাড়া তুলছে না।

কাঠ যথা নিয়মে জ্বলেছে। ধিক্ ধিক্ করে জ্বলে কাঠখানা ছাই হয়েছে। খানিকটা সময় ছাই আঁকড়ে আগুন ছিল। কাঠের যোগান না পেয়ে এক সময় আগুন নিভে গেছে।

তার চেতনা আবার ফিরেছে। গা আগুনের মত গরম। চোখ খুলে শুয়ে আছে। কিছু মনে করতে পারছে না। মাথার মধ্যে একটা গোয়াল ঘর দেখতে পাচ্ছে—আর কিছু নয়।

সে আবার চোখ বন্ধ করলো। এবার গোয়াল ঘর স্পষ্ট হল। গোয়াল ঘরে দুটো বড় গরু। একটা গরুর শিং লম্বা। অন্য গরুটার শিং খানিকটা উপরে উঠে বাঁকা হয়ে নিচের দিকে নেমে গেছে। সারা গায় সাদা সাদা ছিট দাগ। নয়তো গরুর রং জামের মত কালো। অন্য গরুটা বাদামী রঙের। মাথার শিং দুটো চাঁদের মত। কান দুটো থেকে থেকে নাড়ছে। মশা এসে গরুর গায়ে বসছে। গরু মাথা নেড়ে, কানে ঝাপটা দিয়ে মশা তাড়িয়ে দিচ্ছে।

মাঝে মাঝে লম্বা লেজ দিয়ে পিঠের ওপর ঝাপটা মারছে। ভয় পেয়ে মশাগুলো উড়ে যাচ্ছে। বেশি দূর যাচ্ছে না। পাক খেয়ে আবার এসে পিঠের ওপর বসছে। আবার লেজের ঝাপটা। মশা-গুলো উড়ে গেল কিন্তু পালালো না। আবার এল।

গোয়ালে এক নারী। কোমর থেকে ঝুলে আছে খাটো কাপড়। কাপড় হাঁটু পর্যন্ত। বুকে কোন কাপড় নেই। পুষ্ট দুটি উজ্জ্বল স্তন। স্তনের মাঝখানে বৈঁচিফলের মালা। নারীর গলা লম্বা। লম্বা গলা থেকে বৈঁচিফলের মালা ঝুলছে। তার হাতে কুলো। কুলোর ওপর প্রদীপ জ্বলছে। কুলো বুকের নিচে ধরে আছে। কুলোর ওপর দুটি স্তন উচ্চকিত হয়ে কুলোর মধ্যে কি কি আছে তা দেখছে। কুলোয় আছে যব, তিল আর সিঁদুর। প্রদীপের আলো উচ্চকিত স্তনের ওপর খেলছে। কারো চোখ সে দিকে যাচ্ছে না। লোকটি দেখছে আর ভাবছে ঐ উঁচু উঁচু স্তন দুটি কবে দু'হাতে ধরতে পারবে। তখন তার সেই গানটি মনে এসেছিল।

'এ দিক ওদিক ঘুরি আমি নদীর পাড়ে পাড়ে
তুই হঠাৎ নেমেছিলি পাহাড় থেকে
নেমে এসে আমাকে দিলি আলিঙ্গন
বুক দুটোতে দিলি চাপন—জঙ্ঘা থেকে রক্ত শুষে-নিলি—

সে আপন মনে তখন গান করছিল। মুখিয়া সে গান শুনতে পায় নি।

মুখিয়া গরু পূজো করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটা গরু গাভীন। মুখিয়া গাভীন গরু পুজো করবে—মাতৃ বন্দনা। গরু এবার মা হবে। মানুষ যেমন সন্তান ভূমিষ্ঠ করে মা হয় গরুও তাই হয়। এখন সে গাভীন। বিয়োবার সময় হয়েছে। মুখিয়া গরুর ভালোমত বিয়োন চাইছে। হ্যাঁ, গরু তার বাচ্চাটিকে সহজে বিইয়ে দিক। বাচ্চাটা বোঙাঠাকুরের আলো দেখে তিড়িং তিড়িং করে লাফাবে। তখন গরুর বাট নিচের দিকে ঝুলে নামবে।

বাটগুলো দুধের ভারে ভারি হবে। মুখিয়া নিচু হয়েছে। বাটে তিল ছোয়াচ্ছে। এবার তেল মাখাবে। গরুর বাটে দুধ আসবে।

একদিন মুখিয়ার স্তনেও দুধ আসবে। অবশ্য তার আগে মুখিয়াকে মানুষটার সঙ্গে শুতে হবে। হ্যাঁ, তার শরীরের সব গরম মুখিয়ার শরীরের মধ্যে চালান করে দেবে। . এমনি করেই সব হয়, সব কিছু চলছে। মুখিয়া তার বুকের নিচে চাড় খাবে, চাড় খেয়ে সুখ নেবে। সে নিজেও সুখ পাবে।

কি যেন সেই গান? মেয়েরা মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যে বসে গান করে। সে গানের কথাগুলি মনে করতে চাইল। গানের কথাগুলি মনে এল তার—

"হেন্দে চেঁড়ে আরা : ঠোং ঠা
চাঙ্গা দারেরে চারায়ে নাদের দ"

কালোরঙের পাখীর লাল টুকটুকে ঠোঁট গাছের চেরা জায়গায় বীজ আনলো। বীজ ফেলে তুলে আনলো ঠোঁট তার। তাতে সে খুশি হতে পারলো না।

তখন সে কি করলো?

খুশি হয়নি বলে বীজ ফেলছে ভিতরে…"আদের চারা হত ওদোক রুষাড়কেত্"। কালোপাখী লাল ঠোঁট ঢোকাচ্ছে আর বের করে আনছে। বীজ বুনছে। -

গরুর গোয়াল ঘর শূন্য—খা খা করছে। গরু দুটো নেই। গোয়াল ঘরের বেড়া কাত হয়ে পড়েছে। এক দিকের চাল নিচের দিকে নেমে এসেছে। মেঝেতে পচা ঘাস। কতগুলো পিঁপড়ে পচা ঘাসের মধ্য দিয়ে লাইন বেঁধে চলছে।

মুখিয়ার বাপ সাদা চামড়ার মানুষদের ফাটকের মধ্যে আটকে আছে। মুখিয়া আছে বেনিয়ার ঘরে।

তার মনে পড়লো দারোগা সাহেবের কথা। মুখিয়ার বাপ বিদয়া।

বিদরা বলেছিল, শোন গোম্‌কে, বেনিয়া গরু ছুটি বাতিল করে দিয়েছিল। হাড় জির জিরে ছুটো ঘেয়ো গরু মুসলমানদের কাছে বিক্রী করতে পারছিল না। আমাকে গরু ছুটো দিয়ে দিল। বেনিয়া বললো, নিয়ে যা বাতিল গরু ছুটো। যদি বাচ্চা বিয়োয় বড় করে আমাকে দিয়ে যাবি—আর কিছু দিতে হবে না।

গরু ছুটো নিয়ে এলাম। রেড়ির তেল মাখিরে ঘা সারিয়ে কাচ ঘাস খাইয়ে গরু ছুটোকে বদলে দিলুম। গরু ছুটো আমার হোপন কুড়ি হয়ে গেল। হ্যাঁ, আমার আরো ছুটো সন্তানের মত। মুখিয়া পাহাড়ের কোলে নিয়ে গিয়ে কচি ঘাস খাওয়ায়। কেন খাওয়াবে না গোম্‌কে বল। ওরা হল মুখিয়ার বোনের মত।

গরু ছুটোর চেহারা বদলে গেল। ওরা আবার জোয়ান হয়ে উঠলো। গায়ের রং চান্দোবোঙার আলোতে চক্ চক্ করে। একটা গরু গরম হয়ে গেল। গরম হলে গোম্‌কে তুই জানিস মরদের কাছে নিয়ে যেতে হয়। আমি তখন ক্ষেতের কাজে। মুখিয়া মুখিয়ার মা গরুটাকে একটা তেজী ষাঁড়ের কাছে নিয়ে গেল। সে ষাঁড় গরুটাকে ঠাণ্ডা করে দিল। গরু পোয়াতী হল।

এবার গরু বিয়োবে। খবর পেয়ে বেনিয়া এল। বললো আমার গরু ফেরত দে। ছ'শাল হয়ে গেছে এবার ফেরত দে। খত বের করে দেখালো। গরু ছুটো আমি ধারে কিনেছি। টাকা দেইনি। টাকা দেইনি বলে স্থদ হল। বেনিয়া স্থদ জুরলো। 'লক্ষ্মীর খাতায়' অনেক টাকা জমা হল।

বিদরার চোখে জল। সে বললো, বেনিয়া মিথ্যা কথা বললো। জাল খত দেখিয়ে গরু কেড়ে নিল। আমি দিলাম না। বেনিয়া শানিয়ালালকে ডেকে আনলো। জোর করে গরু নিয়ে গেল। এখন তোকে ডেকে আনলো খতের টাকা আদায় করতে। বেনিয়া চামার, মিথ্যাবাদী। তুই গোম্‌কে বিচার কর, বাচ্চা হলে আমি বেনিয়াকে দিয়ে আসতাম। টাকার কথা ছিল না। ও শালা মিথ্যা খত

নিয়ে এসেছে। গোম্‌কে, আকাশে শিংবোঙা আছে তুই বিচার কর।

বিদরাকে দারোগা ধরে নিয়ে গেল। বিদরা কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল ফাটকে। কিন্তু বিদরা ফাটকে থাকলো না, পালিয়ে এল। বিদরা বেনিয়ার বাড়ি গিয়ে তাকে চোট দিল। তার মেয়ের মত গাই গরুর একটা গরু আবার ধরে নিয়ে এল।

পরের দিন আবার দারোগা এল। মুখিয়া, বিধরা, মুখিয়ার মা সবাই সদরে গরুর মত দড়িতে বাঁধা হয়ে চালান হয়ে গেল।

এখন মুখিয়া হয়ত বেনিয়ার বীজ নিয়ে পেট ফুলিয়ে কাঁদছে।

গোয়াল ঘর মিলিয়ে গেল। পেটমোটা মুখিয়াকে আর দেখতে পাচ্ছে না। কে যেন টাঙ্গী দিয়ে গাছ কাটছে। হা-হা করে মুখে আওয়াজ করছে আর টাঙ্গী মারছে মুখিয়ার তলপেটে। মুখিয়া এক এক আঘাতে কুঁকড়ে যাচ্ছে, মাঝে মাঝে কঁকিয়ে উঠছে। কেউ শুনছে না। বেনিয়া টাঙ্গী মেরেই চলছে। কাঠের টুকরো ছিটকে ছিটকে যাচ্ছে। একটা টুকরো এসে মানুষটার চোখে লাগলো।

মুখিয়া চেয়েছিল লাল টুকটুকে ঠোঁটের ছটফটে একটা পাখী। সে জানু পেতে নিল টাঙ্গীর কোপ। মানুষটি নিষ্পলকে তাকিয়ে রইল। এখন চোখ তার ঝাপসা। তবু সে তাকিয়ে আছে। ভাবলো, শনিয়ালাল লাশ হয়ে গেল। অনেক দীকু আর সাদা চামড়ার মানুষকে লাশ বানানো দরকার ছিল।

সে একা। একটা মানুষ কটা লাশ বানাতে পারে? মরদরা সব টাকার জন্য সাদা চামড়ার মানুষদের কাজ করতে যায়। মেয়েরা যায় রাস্তা তৈরী করতে। পাথর এনে ফেলে আর পেট ফোলায়। সে থুথু ফেললো।

অন্ধকার গুহার মধ্যে সে শুয়ে আছে। তার পিঠের নিচে পাথর। একখানা পা নেই, শয়তানের পা হয়ে ঝুলে আছে। আবার মনে পড়লো আগুনের কথা। আগুন কোথায় রেখেছে

মনে করতে পারলো না। উঠে বসতে চাইল কিন্তু পারলো না।

আবার শুয়ে পড়লো। চোখ বন্ধ হল না। হঠাৎ মনে পড়লো যে সে উলঙ্গ। তাতে কি আর আসে যায়। নগ্ন হয়ে মানুষ আসে আবার নগ্ন হয়ে যায়। এর মাঝখানে নতুনত্ব হল কিছুদিন পুরুষ অঙ্গটিকে ঢেকে রাখার জীবন। লাল ঠোঁটের কালো পাখীটাকে ঢেকে রাখার দরকার আছে। নয়তো চিড়িয়াগুলো যখন তখন গরম হয়ে উঠবে। দিন মানে সিংবোঙা যখন আকাশে তুমি তোমার শরীরের গরম একটা নরম চিড়িয়ার গায়ে লাগিয়ে দিচ্ছ। এটা ভালো নয়। গরম হয়ে ওঠা আর চিড়িয়ার শরীরে গরম মাখিয়ে দেওয়া হল রাত্রির কাজ। সিংবোঙা যতক্ষণ আকাশে ততক্ষণ তোমার গরম লুকিয়ে রাখতে হবে।

এখন শীত করছে। হ্যাঁ, সারা শরীর কাঁপিয়ে দিচ্ছে। মাঘের শেষ রাত্রে এরকম কাঁপুনী দেয়। তখন তারা আগুন উসকে দেয়। কাঠের আগুনের তাপ এসে গায়ে লাগে।

এখন সেই উত্তাপ সে নিজের মধ্যে অনুভব করছে। তার শরীর কাঠের মত জ্বলছে। তবুও শীত। পায়ের নিচ থেকে ঠাণ্ডা যেন ওপর দিকে উঠে আসছে। তার সঙ্গে কোন কাপড় নেই।...নাইবা থাকলো। সে তো সাদা চামড়ার মানুষ নয় যে লজ্জায় মরে যাবে। সাদা মানুষরা অনেক রকম পোষাক পরে। কেন এত কাপড় জামা পরে তা কারো জানা নেই।

লজ্জা? শরীর নিয়ে লজ্জা। শরীরের কোন অংশ কেন লজ্জার তাই সে বুঝতে পারে না। শরীরের সব অংশই তোমার। ঢেকে রাখবার মত কি আছে যে ঢেকে রাখতে হবে? সে আপন মনে ভাবছে, শরীরে দাগ থাকা ভালো নয়। হ্যাঁ, শরীরে দাগ থাকলে ঢেকে রাখতে হয়। দাগ থাকা শরীর দেখাতে কার আর ভালো লাগে। তখন শরীর ঢাকতে হয়। পাঁচ জনের চোখের সামনে লুকিয়ে রাখতে হয়। সে কি লুকবে? তার শরীর নিখুঁত। তার

বুকের ছাতি পেটাই করা। কোমর সরু, ভারী নিতম্ব। তার জানুসন্ধি পিচ্ছিল। সে লুকিয়ে রাখবে কোন জায়গা ?

এ সব ভাবনার এখন আর কোন মূল্য নেই। আগের মত শালপাংশু শরীর আর নেই। এ ক'দিনের অনাহার অনিদ্রায় শরীর কাহিল। উঠে বসবার মত শক্তি এখন আর নেই। একটা জোয়ান মানুষের এর চেয়ে লজ্জার আর কিছু থাকতে পারে না।

পেটের চামড়া পিঠের সঙ্গে লেগে আছে। পেটের মধ্যে এখন বসে আছে ক্ষুধা নামক হায়না। ক্ষুধার্ত হায়নাটা জেগে বসে আছে। সে খাবার না পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে মাঝে মাঝে থাবার নখ দিয়ে পেটের ভিতর আচড় কাটছে।

খাবার কথা ভাবতে হচ্ছে। সে শুয়ে খাবার কথা ভাবছে। খেতে হলে উঠে বসতে হবে—সেতো প্রাণান্তকর শাস্তি। নিজের পাখানা আর নিজের নেই। যদি পারতো শয়তানের ধরে রাখা পাখানা কেটে ফেলতো। শয়তানের পা নিয়ে এই কষ্ট সহ্য করা অসহ্য।

তাকে এখন বসতে হবে। কোন কষ্টের কথা ভেবে লাভ নেই। তাকে তার নিজের পায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। নিজেকে ভয়ানক দুর্বল লাগছে। পেটে কিছু খাবার না ফেললে পরে আর নিজেকে সামলাতে পারবে না।

ঘরের কথা মনে এল। ঘরে থাকলে পেটপুরে দাকা (পান্তা) ভাত খেতে পারতো। মালতা পাতা এনে থেতো করে লাগিয়ে রাখতো। হয়তো বুড়ো বাপ ওঝা ডেকে আনতো। ওঝা এসে খড়ি পেতে শয়তানটাকে চিনে নিত। কতরকম ডান আর শয়তান অরণ্যের মধ্যে থাকে। ওঝা দাঁত কামড়ে চালের গুঁড়ি ছিটিয়ে তাদের চিনে নেয়। তেল সিঁদুর দিয়ে ঝেরে শয়তানকে তাড়িয়ে দিত। শয়তান চলে গেলে তোমার পা আবার তোমার পা হল।

এমনি করে তারা শয়তান আর ডানের থাবা থেকে নিজেদের রক্ষা

করে। পিতৃপুরুষদের কাল থেকে এক রীতি চলে আসছে। সে পুলটুস লাগিয়ে চাটাইয়ের ওপর শুয়ে থাকতে পারতো। মাঝে মাঝে দিত গরম সেঁক। একবার বোলতা তাকে কামড়ে ছিল। হাত পা ফুলে গেলে গরম গোবরের সেঁক লাগিয়ে ভালো হয়েছিল। তখন সে চাটাইয়ে শুয়ে থাকতো। চাটাইতে শুয়ে থেকে শাক ভাজা দিয়ে দাকা ভাত খেত। ছোটবেলার অনেক কথা পর পর তার মনে এল।

মন তার বেদনায় ভরে গেল। চোখ ঝাপসা হয়ে এল কিন্তু কাঁদলো না। জোয়ানদের চোখের জল লজ্জার। অবশ্য এখানে কোন মানুষ নেই, কিন্তু পাথর আর অন্ধকার আছে। তারা দু'চোখ মেলে দেখছে আর বিচার করছে। বুঝতে চাইছে তুমি মরদ কিনা।

সে একা। মানুষ মাত্রেই একা আসে একা যায়। মাঝখানে থাকে সমাজ জীবন এই হল মানুষের জীবন। জীবন মানেই আত্মীয় আর সমাজ। মানুষকে এই দুই জনকে নিয়ে জীবন চালাতে হয়, চলতে পারার নাম জীবন।

এখন অনেক বড় বড় কথা মনে আসছে। এর আগে এ সব কথা এ রকম তার মনে আসেনি। বস্তির বয়োবৃদ্ধরা এ সব কথা জানে। বয়োবৃদ্ধরা নানা সামাজিক অনুষ্ঠানে বলে তারা শোনে। শুনে শুনে তারা মরদরা অনেক কিছু জেনে নেয়। তারা নিজেরা এক দিন বুড়ো হবে, তখন তারা আবার বলবে। এ রীতি অনেক দিন ধরে চলে আসছে। কতদিন কতকাল ধরে চলে আসছে তাতো তাদের কারো জানা নেই।

সমতলের মানুষরা অন্যরকম। তারা তাল পাতার পুঁথি পড়ে। ঐ সব পুঁথিতে কি লেখা আছে তা সে জানে না। শুনেছে, অনেক রকম জ্ঞানের কথা লেখা আছে। যা যা জানা দরকার তার সব কথাই লেখা থাকে। পরের ক্ষেত, গরু, ছাগল যে নিতে নেই তা বোধহয় লেখা থাকে না। লেখা থাকলে দীকুরা তাদের সর্বস্ব কেড়ে

নিয়ে নিত না।

সাদা মানুষরা লেখে সাদা কাগজে। দীকুরা পুরনো রীতি ভেঙ্গে এখন সাদা কাগজে খত লেখে। ছবির মত। ছবির পাশে ছবি এঁকে অনেক কথা লিখে রাখতে পারে। তারা নিজেরা এরকম পুঁথি তৈরী করতে জানে না। তারা যা যা মনে রাখা দরকার সব মনে রাখে আর সব ভুল যায়। ছবি এঁকে এঁকে কিছু মনে রাখতে হয় না।

তাদের ঘরের মেয়েরা ছবি আঁকতে পারে—সে ছবিগুলি অন্যরকম। রঙ আর রেখা দিয়ে ঘরের দেওয়ালে ছবি আঁকে। তাদের ছবিতে জ্ঞানের কথা থাকে না। আমি বেঁচে আছি, বেঁচে থাকতে চাওয়ার ছুটো খবর লেখা থাকে। সমতলের মানুষরা এরকম সহজ কথা লেখে না। তাদের সব কথা কঠিন—এমন কঠিন যে স্বয়ং বোঙাঠাকুরও জানে না।

সাদা মানুষরা হয়তো আরো কঠিন কঠিন কথা লেখে। তারা তাল পাতায় লেখেই না। তাদের লেখালিখি, দাস খত অনেক ভারি আর মোটা মোটা। কাঠের উঁচু আসন তৈরী করে তার ওপরে বসে। তারা নিজেরা বোঙাঠাকুরের জন্য আসন তৈরী করে। মাটি আর পাথর হল তাদের ঠাকুরের বসার আসন। সাদা চামড়ার মানুষরা উঁচু আসনে ঠ্যাং ঝুলিয়ে নিজেরাই বসে থাকে। দেখে মনে হবে শুভোবাবু (রাজা) বসে আছেন। মুখে একটা কালো নল। সে নল থেকে ধোঁয়া বেরিয়ে আসে। ধোঁয়ায় থাকে মিষ্টি গন্ধ। দীকুরা হাতে হুঁকো ধরে ধোঁয়া খায়। তাদের মত চুটিয়া খাবার কথা সাদা চামড়ার মানুষ আর দীকুরা ভাবতেই পারে না।

সাদা চামড়ার মনুষরা শোয় আকাশের ওপর। পালকির মত একটা আসন তৈরী করে তার মাঝখানে ঘুমোয়। পিঠের নিচে থাকে অনেক কাপড়। একের পর এক কাপড় সাজিয়ে অনেক উঁচু করে নেয়। কাপড়ের ভিতর ঢুকিয়ে দেয় তুলো। সেই কাপড় আর

তুলোর মধ্যে সাদা চামড়ার মানুষরা চিত হয়ে শুলেই হারিয়ে যায়, আর তাকে দেখতে পাওয়া যায় না। আবার দেখা যাবে ঘুম ভাঙ্গলে।

সে এলোমেলো ভাবে নানা রকমের কথা ভাবছে। কয়েকবার লিঠা শয়তানের কথা মনে এল। কখন যে কার কাঁধে চেপে বসে তা বোঝা যায় না। সে নানা রকমের রূপ ধরতে জানে। যুবতী নারী অথবা একটা খাসী হয়ে তোমার সামনে দাঁড়াতে পারে যাতে তুমি প্রলুব্ধ হও। কখনো কখনো হাওয়া হয়ে যুবতী মেয়েদের ভিতরে সেঁধে যায়। তখন সে সব মেয়েদের পেট ফুলে ওঠে। মেয়েরা বলতে পারে না পেট ফুলিয়ে দিল কোন মরদ।

মেয়েটা গিয়েছিল পাহাড়ের কাছে। ঝর্নায় উলঙ্গ হয়ে স্নান করলো। লিঠা শয়তান দেখতে পেল তার ভারি স্তন আর জানু-সন্ধির রাঙ্গা ধাতী ফুল। ব্যাস অমনি হয়ে গেল। ধাতী ফুলের মধু খেতে লিঠা শয়তান হাওয়া হয়ে এল।

হঠাৎ সে একটা লাল গরু আবার দেখতে পেল। শনিয়ালাল গলার মাঝখানে টাঙ্গী নিয়ে রাস্তার ওপর পড়ে আছে। তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে একটা লাল গরু।

এবার সে চোখ খুললো। প্রথমে চোখে একটু ঝাপসা দেখলো। তারপর চোখ পরিষ্কার হল। বুকের ভিতর তৃষ্ণা টের পেল। গলা শুকনো লাগছে। খাবার কথা মনে এল। সঙ্গে সঙ্গে টের পেল কি তীব্র খিধে তার পেটের মধ্যে ঘুমিয়ে ছিল। এবার জেগে উঠছে। খিদে আর আকণ্ঠ তৃষ্ণা নামে দুই অজগর এক সঙ্গে তাকে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরছে।

এবার সে উঠে বসতে চাইলো। মাথা তুলতে পারছে না। মাথা এখন পাথর হয়ে গেছে—নয়তো এত ভারি কেন? মাথা যত ভারি হোক তাকে তো উঠতেই হবে। মুশকিল হল ঐ পাখানা। কি ভয়ঙ্কর শয়তান হয়ে তার শরীরের সঙ্গে ঝুলে আছে। একটু নাড়া

আগলেই মাথার মধ্যে ঝন্ ঝন্ করে টাঙ্গীর কোপ পড়ছে।

এখন একের পর এক টাঙ্গীর কোপ তাকে খেতে হবে। এ সব জেনেও আর শুয়ে থাকতে পারলো না। এবার তাকে উঠতে হবে। তোমার কষ্ট হচ্ছে—এ সব কথা ভেবে কোন লাভ নেই। সে আপন মনে ভাবছে, মিঠা শয়তান একখানা পা দাঁত দিয়ে কামড়ে খেয়ে নিয়েছে। একটা মানুষের জীবনে এরকম ঘটনা ঘটতেই পারে। তোমার ছুঁড়ে দেওয়া একটা তীর দাবনায় বিঁধিয়ে নিয়ে শম্বর জঙ্গলে পালিয়ে যায়। দাবনায় তীর বিঁধে আছে বলে সে কি বসে থাকে?

এখন তাকে পাহাড় থেকে নিচে নামতে হবে। ভাঙ্গা পাখানাকে সঙ্গে করে টেনে নিয়ে নামতে হবে একটা থেঁতলে যাওয়া ইঁদুরের মত। সামনের সবুজ মাঠখানা পাড়ি দিতে হবে। মাঠ পাড়ি দিতে পারলে তৃষ্ণার জল।

পাহাড় থেকে নিচে নামতে পারলে সমতলভূমি পার হতে পারবে। সমতল ভূমির সবুজ মাঠখানা তার দেখা আছে। দু' দু'বার পাড়ি দিয়ে পেটভর্তি করে জল পান করেছে। মাঠখানা আশ্চর্য রকমের সমতল। পাহাড়ের গা ঘেঁষে এমন সমতল জমি দেখা যায় না। কচ্ছপের বুকের মত সমতল জমি চিত হয়ে রোদের মধ্যে টান টান হয়ে শুয়ে আছে।

তবে এই পা। হ্যাঁ, টাঙ্গীখানা সঙ্গে থাকলে সে কেটে ফেলে দিত। টাঙ্গীখানা নেই। টাঙ্গী যখন সঙ্গে নেই পাখানা যখন কেটে ফেলতে পারছে না তখন—সে নিজেকে ধমক দিল এবার। কি যাতা ভাবছিস। এ সব আজগুবি ভাবনা ফেলে দিয়ে নিচে নেমে যা। যতক্ষণ বাঁচা আর বেঁচে থাকা ততক্ষণ মরদ হয়ে থাকবার কথা ভাব। এই পালিয়ে আসা, গভীর জঙ্গলে আত্মগোপন দুটোই ভুল। ভয়ে তুই নিজেকে নিজে এই সর্বনাশের মধ্যে নিয়ে এলি। তোর পক্ষে মরদের কাজ ছিল আরো কয়েকটা খতনার দীকু আর সাদা চামড়ার মানুষকে শেষ করে দেওয়া। আর সে ভাবতে পারছে না।

পায়ের রক্ত গরম হয়ে উঠছে। রক্ত যত গরম হয়ে উঠছে তত নানা রকমের ভাবনা মাথার মধ্যে বুটকুরি কাটছে।

সে আপন মনে ভেবে চলছে, এই যে পালিয়ে আসা একটা কুত্তার কাজ হয়ে গেছে। সে পালাবে কেন নিজের বস্তি থেকে? পা দুটোকে গোঁজ করে ধরিত্রীর বুকে গেঁথে দাঁড়িয়ে থাকবে। একটা রক্তচোষা খতনার নেকড়ে তোমার বুকে দাঁত বসিয়ে ঝুলে আছে। সে তোমার রক্ত খেয়ে নিচ্ছে। তুমি চুপ করে থাকতে পারনা। তুমি মরবে অথবা মারবে এইত নিয়ম।

সে নিয়ম ভেঙ্গেছে। পা এখন এক খতনার শয়তান হয়ে শরীরের সঙ্গে ঝুলে আছে। নয়তো ফিরে যেত বস্তিতে। মরদদের ডেকে বলতো, তুরা শুন। মানবক নাই, মানবক নাই জুলুম।

চান্দোবোঙ্গা নিয়ম করে দিয়েছেন—অভ্রান্ত সে নিয়ম। তুমি কেড়ে নিয়ে খেতে পারনা। এ অন্যায়। তুমি তোমার খাদ্য জুলুমবাজের হাতে তুলেও দিতে পার না—এটাও অন্যায়। তোমরা মাথা নিচু করে দিলে। ভাবতে ভাবতে তার মাথা গরম হয়ে গেল। সে আবার জ্ঞান হারালো।

গুহার মুখ থেকে বাইরে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করলো না। গুহার ওপর দিকে ফোকর আছে। ফোকর থেকে সমতল জমি দেখা যায়। এবার সে ফোকর দিয়ে নেমে যাবে পাহাড় থেকে। মাঠের কাছে যাওয়া হবে অনেক সহজ। গুহামুখ ব্যবহার করলে তাকে যেতে হবে ডান দিকে। পার হতে হবে কতগুলো পড়ে থাকা উঁচু নিচু পাথর। ফোকরের পথ সংক্ষিপ্ত পথ। খানিকটা পথ দুর্গম তার পরে সবটাই সহজ।

এখন সে সহজ পথে জলের কাছে পৌঁছতে চাইছে।

তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফেটে যেতে চাইছে। তাই পায়ের কথা আর ভাবছে না। পা এখন তার কাছে অপ্রয়োজনীয়। তবু পাখানা হাঁটু থেকে ঝুলে আছে। সেই ঝুলে থাকা পাখানাকে

সঙ্গে টেনে নিয়ে যেতে হবে। দুর্ভাগ্যের হলেও এখন তাকে স্বীকার করে নিতে হবে।

সে ফোকরের কাছে এল। এবার ফোকরের মধ্যে উঠে পড়তে হবে। একখানা পা ভরসা করেই করতে হবে। ফোকরে উঠে কি ভাবে নিচে নামবে তা সে জানে না। আপাতত ভাবছেও না। ভেবেও বা কি লাভ? এখন যা যা ঘটবে তা ঘটতে দিতে হবে।

মাথার মধ্যে যন্ত্রনা অনুভব করছে। টাঙ্গী দিয়ে কে যেন গাছ কোপাচ্ছে। গাছটা তার মাথার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। টাঙ্গী এসে মাথার মধ্যে গেঁথে বসছে। একখানা টাঙ্গী মাথার মধ্যে গেঁথে থাকলে সে কি করতে পারে? না, কিছু করতে পারবে না। পারে শুধু দাঁতে দাঁত লাগিয়ে সহ্য করতে।

মনে এল আবার শনিয়ালালের কথা। শনিয়ালালের সঙ্গীরা কত সহজে তাকে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে ফেলেছিল। সে আর বাধা দিতে পারেনি। ততক্ষণে তার হাতের লাঠি বেহাত হয়ে গেছে সেতো খতনার জানোয়ার শনিয়ালালের মাথার ওপর লাঠি তুলেছিল।

বুড়ো বাপ রাস্তায় পড়ে জিভ বের করে দিতেই তার মাথায় খুন চেপে বসেছিল। এক লহমায় সারা শরীরের রক্ত উঠে এসেছিল মাথায়। একটা অন্ধকার ঘরে সে অনেক ঘাম ঘেমেছে। ছিল শ্রান্ত। ভয়ানক ক্লান্ত। কিন্তু ঐ বুড়ো বাপের মৃত্যু দেখে মুহূর্তে তেতে উঠেছিল একটা মরদের মত। ভিতরের মানুষটা বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। নয়তো সেই মুহূর্তে অমন ক্ষেপে যেতে পারতো না। নিজের শক্তি সামর্থের কথা একদম ভুলে গিয়েছিল।

পথেই তাকে জাপটে ধরলো শনিয়ালালের অনুচরেরা। হাত থেকে লাঠি কেড়ে নিয়ে গাছের সঙ্গে বেঁধে ফেললো।

শনিয়ালাল হুকুম দিতে সেই লোকটা এগিয়ে এল। মাথার ঝাঁকরা ঝাঁকরা চুল। একটা চোখে বাঁকা দৃষ্টি। নিচের ঠোঁট

একটু বেশি ফোলা। এসে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ালো। হাতের মুঠো থেকে চাবুকখানা নিচে ঝুলে ছিল। মনে হয়েছিল একটা সাপের লেজ মুঠো করে ধরে মানুষটা দাঁড়িয়ে আছে।

লোকটা তার পিঠখানা দেখলো। কোথায় চাবুক মারবে তা ঠিক করে নিল। হাত তুলে চাবুক কশালো পিঠের ওপর। তখন মনে হয়েছিল এক ঝলক বিদ্যুৎ যেন ঝলক খেল মাথার মধ্যে।

নিজেকে অনেক কষ্টে ফোকরের মধ্যে তুলে ফেললো। মাথার মধ্যে কতবার যে সাপের মত চাবুক ছোবল হানলো তার হিসাব নেই। আর তার এই ঝুলে থাকা পাখানা। থেকে থেকে পায়ের মধ্যে টাঙ্গীর কোপ পড়ছে। তার সারা দেহ অসহ্য যন্ত্রণায় কেঁপে কেঁপে উঠছে। সে দাঁতে দাঁতে লাগিয়ে খতনার জানোয়ার শনিয়ালালের কামড় সহ্য করছে।

শনিয়ালালের ভিতরে যে শয়তানটা ছিল, এখন সেটা তার পায়ের মধ্যে। অসহ্য শনিয়ালালের প্রেতাত্মাটাকে টেনে টেনে ফোকরের মধ্যে তুলে আনবার এই চেষ্টা। কিন্তু সে এখন নিরুপায়।

ফোকরের মধ্যে উঠে আসতে পেরে সে খানিকটা স্বস্তি অনুভব করলো। পাহাড়ের নিচের সমতল সবুজ মাঠখানা দেখতে পেল। দুপুরের রোদে গর্ভবতী হবার জন্য উন্মুখ যুবতীর মত চিত হয়ে শুয়ে আছে।

ফোঁকর থেকে বেরিয়ে আসার সব থেকে সহজ উপায় শুয়ে পড়া। সে গিরগিটির মত লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লো। ভাঙ্গা পাখানাকে লম্বা করে শুইয়ে দিতে অনেক বেগ পেতে হল। সে দাঁতে দাঁত লাগিয়ে যা যা করলে পাখানা লম্বা হয় তা করলো। এবার মাথা তার বাইরে। মাথায় ঠাণ্ডা হাওয়া এসে লাগলো। মাথা পাথরের ওপর পেতে রাখলো। হাওয়া আর মাথার ওপরের আকাশ তার যন্ত্রণা অনেক কমিয়ে দিল।

তাকে এবার নিচে নামতে হবে। সে তার শরীর আরো নিচের দিকে নামিয়ে দিল। কোমর থেকে তার শরীর বাইরের পাথরের ওপর ঝুঁকে আছে। হাত লম্বা করে দিয়ে নিচের পাথর ধরে আছে। এবার ভাঙ্গা পাখানাকে টেনে নিচে নামিয়ে আনতে হবে। কি ভাবে অসম্ভবকে সম্ভব করবে বুঝতে পারছে না। ভাঙ্গা পাখানা তার কোন কথাই আর শুনছে না অথচ ঝুলে আছে তার শরীরের সঙ্গে :

তবু তার পাখানাকে টেনে বের করে আনতে হবে। এখন সব থেকে জরুরী যা তা করতেই হবে। আকাশের চান্দোবোঙা দেখুক খতনার শনিয়ালাল তার কি হাল করে দিয়েছে।

এবার তার লগুড় আর বর্শার কথা মনে এল। লগুড় অপেক্ষা বর্শা অনেক কার্যকরী। বর্শাখানা পেতে হলে আবার গুহার মধ্যে ঢুকতে হবে। তা আর সম্ভব নয়, সে আপন মনে ভাবলো। এখন তাকে বাইরের দিকে নামতে হবে। অবশ্য পেছনের অংশ নিচের দিকে নামিয়ে আনাও সহজ নয়। কি আর করবি তুই? সে নিজেকে নিজে প্রশ্ন করে সান্ত্বনা খুঁজলো।

শেষ পর্যন্ত দু'খানা পা বাইরে বেরিয়ে এল।

এখন সে পাথরের ওপর আকণ্ঠ তৃষ্ণা নিয়ে শুয়ে আছে। বুক পাথরের সঙ্গে লেপ্টে আছে। এ ভাবেই বুক ঘষে এবার নামতে হবে। পাথরখানা পার হয়ে তবে ভাবতে পারবে বসা অথবা দাঁড়াবার কথা। আপাতত বসা বা দাঁড়াবার কোন সুযোগ নেই।

তার মাথা নিচের দিকে। পা ওপরে—সে একটা গিরগিটি হয়ে বুক বেয়ে নিচের দিকে নামছে।

গিরগিটির মত নামছে আর নামছে। পাথরখানা শেষ হতে চাইছে না। চোখের সামনে শুধু লম্বা হয়ে যাচ্ছে। তবু সে পাথর বেয়ে নামছে। আর একখানা পাথরের কাছে এসে পড়লো। এ পাথরখানাও চিত হয়ে আছে। সে চিত হয়ে থাকা পাথরখানার

ওপর উঠে এল। এবার হয়তো বসতে পারবে অথবা দাঁড়াবে। হাতে লগুড় বা বর্শা কোনটাই নেই। যে কোন একটা হাতে থাকলে দাঁড়ানো হত অনেক সহজ।

তার বাঁ দিকে একখানা বড় কালো পাথর। পাথরখানা খাড়া হয়ে পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে। পাথরখানার বাঁ পাশ থেকে নেমে যাবার মত জায়গা আছে।

নিচের চাতালে নামতে গিয়ে তার চোখ স্থির হয়ে গেল। চোখের সামনে দেখেও চিনতে পারছে না। নিজের চোখকে বিশ্বাস করবে কিনা, বিশ্বাস করা যায় কিনা তাই ভাবছে।

কালো পাথরের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে একটা গরু। গরুর গায়ের রং লাল। তার মনে প্রশ্ন জাগলো, ঠিক দেখছে তো? সে চোখ রগড়ে নিল। হ্যাঁ, একটা লাল গরু দাঁড়িয়ে আছে। পাহাড়ের এত ওপরে কি ভাবে উঠে এল বুঝতে পারছে না। কিন্তু লাল গরুটা ওপরে উঠে এসেছে। এখন কালো পাথরের গায় লেপ্টে দাঁড়িয়ে আছে। দুটো বাঁকা শিং বর্শার ফলার মত মাথার দু'দিকে।

মনে এল নিজের পোষা গরুর কথা। তার মাথায় ছিল চাঁদের মত দুটি বাঁকা শিং। লেজ ছিল লম্বা আর কালো। গায়ের রং লাল। মাথার মাঝখানে সাদা একটা ত্রিভুজ। সাদা ত্রিভুজ মাথায় থাকলে সে গরু খুব লক্ষ্মীমন্ত হয়। চুপ চাপ দাঁড়িয়ে থাকে। ভাই বোনের মত হয়ে যায়। বাটে হাত দিলে পেছনের পা দিয়ে চাট মারে না। সে গরু এখন শনিয়ালালের গোয়াল ঘরে আছে।

সে আবার গরুটাকে দেখলো। হ্যাঁ, চুপ চাপ দাঁড়িয়ে আছে। সে অস্ফুট গলায় বললো, একটা লাল গরু। রক্তের ভিতর আশা আর আনন্দের উম্মাদনা জাগলো। অমনি চোখের ওপর একখানা কালো পর্দা নেমে এল।

কালো পর্দা থাকলো না, এসেই হারিয়ে গেল। চোখের দৃষ্টি ধীরে ধীরে আবার স্বচ্ছ হল। চোখের দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়ে ওঠাতে আবার

লাল গরুটাকে দেখতে পেল। ঘাড় বাঁকিয়ে তাকিয়ে আছে। নিচের সমতল মাঠের দিকে তাকিয়ে আছে। শিং দুটি ধারালো। ছিমছাম চেহারা। গর্ভবতী নয় যখন তখন বাটে দুধ থাকতে পারে।

বাট এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না। গরু যখন তখন বাট থাকবেই। এবার সে জিভ মুখের ভিতর নাড়লো। জিভ শুকিয়ে মুখের মধ্যে খস খস করছে।

গরু দাঁড়িয়ে আছে, নড়ছে না। নড়ছে না বলে নিজের চোখ দুটিকে নিজে বিশ্বাস করতে পারছে না। অরণ্যে, পাহাড়ে মানুষ কত কিছু দেখতে পায়। যা দেখতে পায় চোখে তাই সব সময় সত্য নয়। তোমাকে যাচাই করে নিতে হবে। নয়তো অপদেবতা কিংবা মিঠা শয়তানের পাল্লায় পড়ে তুমি শেষ হয়ে যাবে।

বনের মধ্যে পাহাড়ে সব সময় নিয়ম মেনে চলতে হয়। নিজে এখন সে ভয়ানক ক্লান্ত। মাথা নিচু করে ভাবছে সিধুয়ার কথা। বনের মধ্যে একটা যুবতী মেয়ে থাকতেই পারে না। সিধুয়া তা একবারো ভাবলো না। কুড়ি যুবতী দেখে বনের নিয়ম ভুলে প্রলুব্ধ হল। মেয়েটার দুটো বড় বড় পুষ্ট স্তন দেখে তার হাঁটুর মাঝখানে ঘুমিয়ে থাকা লাল ঠোঁটের কালো পাখীটা ছটফটিয়ে উঠল।

সিধুয়া অমনি ভালোবাসা জানাবার গান ধরলো। মেয়েটার কাছে গেল। মেয়েটা গাছের নিচে তার জন্য ফাঁদ পেতে বসে ছিল। উঠে এসে হাত ধরলো সিধুয়ার। বুকের ওপর হাত তুলে দিল। যুবতীর পুষ্ট বুক পেয়ে সিধুয়া পাগলা হয়ে গেল। সে যুবতী মেয়েটাকে বনের মধ্যে নিয়ে গেল। এবার গরম খাবে আর গরম নেবে।

সেই সুযোগে ডান মেয়েটা এক থাবায় সিধুয়ার লাল কলজে খাবলা মেরে তুলে নিল। কলজে খেয়ে নিয়ে ডান মেয়েটা আবার একটা গাছ হয়ে নিজেকে গোপন করে ফেললো।

তারা গড়হাম গাছের নিচে সিধুয়াকে পেল। তার বুকখানা

এক থাবায় ছ'ফাঁক করে ফেলেছে। কলজেহীন সিধুয়া গাছের নিচে চিত হয়ে শুয়ে আছে। ছ'হাটুর মাঝখানের লাল ঠোঁটের কালো পাখীটা রক্তাক্ত। আর কোথাও কোন রক্ত নেই। বুকের খোদল হাঁ হয়ে আছে। ভিতরের দিক একেবারে চেছে পুছে ভান মেয়ে মানুষ খেয়ে নিয়েছে।

সে আরো নিচে নেমে এল। ভাঙ্গা পাখানা নিচে টেনে আনতে বুক যেন ফেটে যাচ্ছে। মাথার মধ্যে হা-হা করে টাঙ্গীর কোপ পড়ছে, সে গ্রাহ্য করছে না। 'তৃষ্ণা তাকে মরিয়া করে তুলেছে। গলা এমন ভাবে শুকিয়েছে যে জিভ এখন ভিতর দিকে ঢুকে যেতে চাইছে।

আরো নিচে নামলো। এবার গরুটিকে আরো স্পষ্ট দেখতে পেল। পাথরের গায় লাল গরুটা গা লেপ্টে দাঁড়িয়ে আছে। একটা গরু পাথরের গায় লেপ্টে থাকতে পারার সম্ভাব্যতার প্রশ্ন তার মনে জাগলো না। গরুটাকে একটা আঁকা গরু বলে ভাবছে না। পাথরের গায়ে আঁকা একটা গরুর ছবি তার চোখে এখন জীবন্ত।

নিচে নামবার কথা ভুলে গেল। নিচে নামবে কেন? তার হাতের সামনে একটা লাল গরু দাঁড়িয়ে আছে। গরুর মাথায় ছুটি ধারালো শিং। একটা মানুষের বেঁচে থাকার জন্য আর কি দরকার? সব থেকে জরুরী হল একটা গরু। ছুটো গরু হলে সব থেকে ভালো। যদি ছুটো গরু তুমি না পাও, সে নিজেকে নিজে জিজ্ঞাসা করে।

তবে একটা গরু আর সেই গরু হবে তোমার মায়ের মত অথবা বোনের মত। মা অথবা বোন যা হয় একটা কিছু ভেবে নাও আর গরুটাকে ভালোবাস। পেটের ক্ষুধা আর গলার তৃষ্ণা ছুটো প্রয়োজন একটা গরু ভালোভাবে মিটিয়ে দিতে পারে। তবে হ্যাঁ, সে ভেবে বললো—মাঠ চষে ফসল ফলাতে হলে আর একটা গরু দরকার

হবে। একটা গরু দিয়ে লাঙল টানানো যায়—লাঙল গভীর হয়ে মাটির মধ্যে বসে যায় না। দুটি গরু থাকলে মাটির তলদেশের অনেক গভীরে লাঙলের ফলা নামিয়ে দেওয়া যায়।

গাঁও বুড়োরা বলে জমি হল যুবতী নারীর মত। তোমাকে লাল ঠোঁটের কালো পাখীটাকে দিয়ে মন্থন করতে হবে। যত মন্থন করবে তত তার গায়ে সুখ হিল হিল করে খেলবে। সহজেই পোয়াতী হবে।

একটার পর একটা বাচ্চা বছর বছর মেয়েরা প্রসব করে। জমি ঠিক মত মন্থন করলে জঠর থেকে অনেকগুলো অঙ্কুর তুলে দেবে। আকাশে শিংবোঙা আছেন রোদ দেবার জন্য। আকাশ জল নামিয়ে দেবে। তোমার জমি সোনালী ফসলে ভরে উঠবে।

এখন তাকে গরুর কাছে যেতে হবে। পেছন থেকে গরুর বাটে মুখ লাগাতে পারলে পাওয়া যাবে দুধ নামে সেই অমৃত। গরু পেছনের পা দিয়ে চাট মারতে পারে। সে হামাগুড়ি দিয়ে দুটো ঠ্যাংয়ের মাঝখানে ঢুকে যাবে। নিজেকে রাখবে পা দুটোর পেছনে। পা দুটোকে জাপটে ধরবে না। গরুর বাচ্চা যে ভাবে দুধ খায়, ঢুঁশো মারে সে মানুষ হয়ে তাই করবে। গরুটাকে বুঝতে দেবে না যে তার বাচ্চা নয় অন্য আর একজন তার বাটের দুধ খেয়ে নিচ্ছে। সে মানুষ। তাতে কিছু আসে যায় না। সেতো গরুর সন্তান। গরু মায়ের মত।

মানুষের দুটো মা থাকে—একজন ঘরে, অন্যজন গোয়াল ঘরে। এ সব কথা নতুন নয়—সবাই জানে। অবশ্য সমতলের মানুষরাও গরুকে মা বলে পুজো করে। কিন্তু গরুর বাট থেকে দুধের শেষ ফোটা পর্যন্ত নিঙরে নেয়। বাচ্চাটার জন্য এক ফোটা দুধ বাটে রাখবে না। ওদের গরুগুলো সব সময় রোগা। রোদের ছটায় চামড়ার রং ঝলসে ওঠে না।

সাদা চামড়ার মানুষরা আরো অদ্ভুত। তারা গরুকে মা বলে

ভাবতেই পারে না। গরু তাদের প্রয়োজনে বশীভূত এক জীব। এ দেশের মানুষদের ভয় দেখিয়ে যে রকম বশীভূত করে রেখেছে তেমনি গরুকেও করে। গরু ভয় পেয়ে গোয়াল ঘরে থাকে। সাদা চামড়ার মানুষরা সময় মত বাট থেকে দুধ দুইয়ে নিয়ে যায়। গরুকে তারা প্রণাম করে না। গোয়াল ঘর পরিষ্কার রাখে কিন্তু গরুর কাছে মাথা নামাবে না। অদ্ভুত এই সাদা চামড়ার মানুষরা। গরুকে মা বলে না। ভাই বোন বলে ভাবতে পারে না।

সে গুড়ি মেরে আরো খানিকটা নেমে এল। এখন সামনে কাত হয়ে আছে আর একখানা পাথর। ঘরের চালের মত পাথরখানা নিচের দিকে ঝুলে আছে। এবার মাথা নিচের দিকে আর পা দুটো ওপর দিকে রেখে খানিকটা পথ নামতে হবে। পাথরখানার বুক বেয়ে শেষ করতে পারলেই পৌঁছে যাবে গরুর কাছে।

এই তার পা, এই পাখানাকে এখন ঘোরানো কি কঠিন। কিন্তু পা তাকে ঘোরাতে হবে। মাথার মধ্যে টাঙ্গীর কোপ পড়লে তা সহ্য করতে হবে। অথচ সব সহজেই হয়ে গেল। নিচে নেমে কাত হয়ে থাকা পাথর খানার ওপর উঠে যেতে পারলো। এবার নামতে হবে নিচের দিকে।

পাথর বেয়ে খানিকটা নেমে আবার সে পাথরে মাথা নামিয়ে রাখল। এখন একটু দম নিতে হবে। সে আকাশের দিকে তাকাচ্ছে না। তার মাথার ওপর তিনটে শকুন এসে বসে আছে। তাদের ডানার শোঁ শোঁ শব্দ সে শুনতে পায়নি।

মাথা তুলে গরুটাকে আবার দেখতে পেল। এবার সে অবাক হল। নিচে নামতেই গরু অনেক ওপরে উঠে গেছে। ওপরে উঠে আবার পাথরের গায় লেপ্টে দাঁড়িয়ে আছে।

সে অবসন্ন চেতনা নিয়ে কোন রকমে বাঁচার জন্য লড়াই করছে। এখন পা দুটো তার লম্বা। ভাঙা পা কাত হয়ে আছে। ভাঙা পা

বেয়ে আগুনের হল্‌কা মাথার মধ্যে উঠে আসছে—তবু তাকে আবার ওপর দিকে উঠতে হবে। গরুটা এখন খানিকটা ওপরে।

স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে গরুটাকে। আপন মনে বিড়বিড় করে বললো, গরুটা পাথরের গায় লেপ্টে গেল কেন? প্রশ্নের উত্তর খুঁজলো না। মাথা নিচের দিকে নামিয়ে নিল। এবার গরু আরো সপষ্ট হল। গরুটা পাথরের গায়ে একেবারে লেপ্টে দাঁড়িয়ে আছে। এখন গরুর চার চারটে পা আর দেখতে পাচ্ছে না। পেটের নিচে কালো একটা দাগ দেখতে পাচ্ছে অথচ পা চারটে আর নাই।

পাহীন লাল গরু, সে আপন মনে বললো। মাথা নাড়লো। পা নেই এমন গরু দিয়ে জমি চাষ করা যাবে না। অথচ পাহাড়ের নিচেই আছে সমতল জমি। সমতল ভুমির পাশেই জল। চাষ করতে পারলে সোনার ফসল ফলানো যায়। তার বোনা ফসল নিয়ে বিশাল মাঠখানা আকাশের নিচে স্বপ্নের মত শুয়ে থাকতো।

মাঠ ভর্তি ফসল আর লাল গরু। পাহাড়ের পা ঘেঁষে একখানা ঘর। হ্যাঁ, কয়েকটি পরিবার এখানে বসতি তৈরী করতে পারতো। মাঠখানার খোঁজ পেলে মানুষ আসতো—একের পর এক মানুষ। তাদের সঙ্গে তাদের ছেলে মেয়ে। বাচ্চারা মায়ের কোলে ঝুলে আছে। বড়গুলো মায়ের আঁচল ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

মরদটা এসে বলতো, মাঝিন, তুই আমাকে জমি দিবি?

সে হাসতো। বলতো কার জমি কে দেবে?

মরদ বলতো, আমায় একটু জমি দে। চাষ করবো।

সে বলত, তুই জমি নে। লাঙল নামিয়ে দে। তোর কটা বাচ্চারে?

মরদ বলবে, আমার দু দুটো হোপন কুড়ি। আমরা চার জন।

তবে জমি নে তোর যতটুকু দরকার। কাঠের গোঁজ মেরে দে। গোঁজ হল তোর নিশানা। ব্যাশ, আর কি চাই?

মরদটা মাথা নাড়বে। বৌয়ের পানে তাকিয়ে থাকবে। আর কি চাইবার আছে? চষার মত জমি সে পেয়ে গেছে। এখন চোখের সামনে তার সোনালী ফসল। এবার পাহাড়ের গায় একখানা ঘর তুলতে হবে। ঘরে দুটো বাচ্চা আছে। সঙ্গে আছে দুটো জোয়ান গরু। আর কি চাইবার থাকতে পারে একটা মানুষের।

সে থুথু ফেললো পাথরের ওপর। থুথু ফেলে বললো, শনিয়ালাল আসবে। শনিয়ালালের পিছনে ছগনলাল। তাদের সঙ্গে আসবে সাদা চামড়ার মানুষ।

শনিয়ালাল, ছগনলাল আর সাদা চামড়ার মানুষ এসে সামনে দাঁড়ালো। একখানা সাদা কাগজ মেলে ধরলো সামনে। সাদা কাগজের ওপর সিঁদুরের ছাপ। বললো, দে টিপ ছাপটো দে—

সে ঘৃণায় মুখ বিকৃত করে আবার খানিকটা থুথু ফেললো।

সে আবার চোখ তুলে তাকালো। এবার দেখলো একটা গরু নয় দুটো গরু। গরু দুটি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। একটা লাল অন্যটা কালো। আশ্চর্য, কালো গরুর পিছনে আর একটা গরু। পাটকিলে রঙের গরুটার মাথায় ধারালো দুটো শিং। তার পিছনে আর একটা গরু।

অনেক গরু। একটার পাশে আর একটা গরু। অনেকগুলো গরু এখন তার হাতের নাগালের মধ্যে। তবে সে মাঠের জমি সবাইকে দেবে কেন? ইচ্ছে করলে অতবড় মাঠখানার মালিক সে একাই হতে পারবে। মাঠের পাশেই থাকবে বিশাল গোয়াল ঘর।

আবার সে দেখতে পেল শনিয়ালকে। শনিয়ালালের পাশে ছগনলাল। ছগনলাল ইঁদুরের লেজের মত গোঁফ কাঁপাচ্ছে আর থুক ফেলছে। থুক ফেলে বলছে, সাওঁতাল আদমীলোক বুরবাক আছে। উলোক জমি বারহাতে জানে না। সীমানার গোঁজ তুলে লে। দু' হাত সামনে বার। ফির জমিনমে গোঁজ গাথ, উ শালো তুর

অমনি ছু' হাত বারহে গেল।

বুকের মধ্যে ঘৃণা পাক খাচ্ছে। বুক হাপর হয়ে গেছে। কলজে কে যেন ছু'হাতে মুঠো করে চেপে ধরেছে। চোখের ওপর কুয়াশা— সে আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না। চোখের ওপর একখানা কালো পর্দা নেমে আসতে চাইছে।

আর সে মাথা তুলে রাখতে পারলো না।

এখন সে মাথা নামিয়ে রেখেছে পাথরের ওপর। চোখের সামনে কোন গরু নেই। মাথা তোলার মত শক্তি নিজের মধ্যে খুঁজে পাচ্ছে না। গলা শুকিয়ে কাঠ। তৃষ্ণায় বুক ফেটে যেতে চাইছে। পাথরের ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে থাকতে পারছে না

মাথার ওপর খাঁড়া রোদ। সূর্য জলন্ত তামার মত জ্বলে পিঠের ওপর আগুন ছড়িয়ে দিচ্ছে। সে ঘামছে আর কাঠের মত শুকনো হচ্ছে। তবু মুখ তুলে গরুটাকে দেখছে না। আর দেখার বা কি আছে? গরু থাকলে জমি থাকবে। জমি থাকলে চাষী আছে। চাষী থাকলে তাদের ছুইয়ে নেবার জন্য শনিয়ালাল আছে। তার পিছনে ছগরলাল। ছগনলালের পিছনে সাদা চামড়ার মানুষ।

সে মাথা আর তুলছে না। উত্তপ্ত পাথরের ওপর মাথা রেখে ভাবছে। একটা গরু দাঁড়িয়ে আছে অথচ তার চার চারটে পা নেই। এতো হতে পারে না। সে ভুল দেখছে।

আবার মাথা তুললো। না, গরুর একটাও পা নেই। সে চোখ একবার রগড়ে নিল। পাথরের ওপর হাত রেখে বুকে চাড় দিয়ে মাথা ওপরে তুললো। তার চোখ এখন গরুর আরো কাছে। গরুটা কোন জীবন্ত গরু নয়। কাছাকাছি আসাতে গরু ছায়া ছায়া হয়ে গেছে, ছায়া হয়ে পাথরের সঙ্গে লেপ্টে আছে।

তার শরীর বেয়ে শিহরণ খেলে গেল। মৃত গরুর ভৌতিক ছায়া। শনিয়ালালের পেতাত্মা নতুন রূপে এসে সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

খতনার জানোয়ার কখনো মানুষ হয়—এমনি করে নানারূপে তারা মানুষের সমাজে কখনো জঙ্গলে জন্ম নেয়। এখন তাকে প্রলুব্ধ করতে পাথরের ওপর ছায়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হ্যাঁ, তাই—সে আপন মনে ভাবলো।

এখন তার সামনে আর কোন জটিলতা নেই। সে চিনতে পারছে লাল গরুর ছায়া। শনিয়ালালের মত লাল গরু একটা ছলনার ফাঁদ। নানা রকমের প্রলোভন দেখিয়ে তার লোভের লালায় সুড়সুড়ি দিতে এসেছে। এটা নে, ওটা নে বলছে। যত নিচ্ছে তত নিতে ইচ্ছা করছে। দুটো গরুতে আর মন ভরছে না। হাঁটুর ওপর কাপড় থাকলে মন বিগড়ে যাচ্ছে। পিতলের দুলে মেয়েরা আর নিজেকে খুসি মনে করতে পারছে না। মানুষ আরো জমি চাইছে। অপরের জমিতে লাঙ্গল ঢুকিয়ে দিচ্ছে। একটা ঘর থাকতে আর একটা ঘর—তবু থামতে পারছে না। মানুষ আরো চাইছে।

মানুষের চোখ আর মানুষের চোখ থাকছে না। চোখ বদলে যাচ্ছে। চোখের মধ্যে হায়নার লোলুপ দৃষ্টি জেগে উঠছে। ঠোঁটের দু' পাশ বেয়ে লালা নেমে আসছে। লোভের লালা চিবুক বেয়ে নিচে নামছে, বুকের ওপর পড়ছে। বুক ভিজে যাচ্ছে তবু তৃষ্ণা মিটছে না।

লাল গরু গরু নয় শনিয়ালাল। একটা খতনার জানোয়ারের প্রেতাত্মা। মানুষ থাকলে মানুষের মধ্যে মানুষের রূপে ক্ষতনার জানোয়ার থাকবে। এখন সে আর লাল গরুটাকে দেখতে পাচ্ছে না। পাহাড়ের গায় লেপ্টে দাঁড়িয়ে আছে ক্ষতনার শনিয়ালাল।

মানুষ থাকলে শনিয়ালাল থাকবে—অনিবার্য সত্য সে মেনে নিতে পারছে না। ঘৃণা আর ক্ষোভে তার সারা শরীর জ্বলছে। মাথায় রক্ত উঠে আসছে উত্তেজনায়। শিরা উপশিরা টান্ টান্।

চিৎকার করে বলতে চাইল, শনিয়ালাল হঠ যা। ফের টাঙ্গী মাইর্ব।

এবার সে টাঙ্গী মারার জন্য হাত মুঠো করলো।

হাত মুঠো করতেই কনুই পাথরের ওপর পিছলে গেল। বুক আছড়ে পড়লো পাথরের ওপর। কোমর সরে গেল। ভাঙ্গা পা উল্টে গেল সামনের দিকে। কে যেন টাঙ্গীর কোপ মারলো মাথার মধ্যে। তার শরীর উল্টে গেল।

উল্টে যাওয়া দেহ সর সর করে নামতে থাকলো নিচের দিকে। তখনো সে হাতের মুঠো খোলেনি।